প্রতিদিন ১৪ অক্টোবর ২০০৭

রোববার

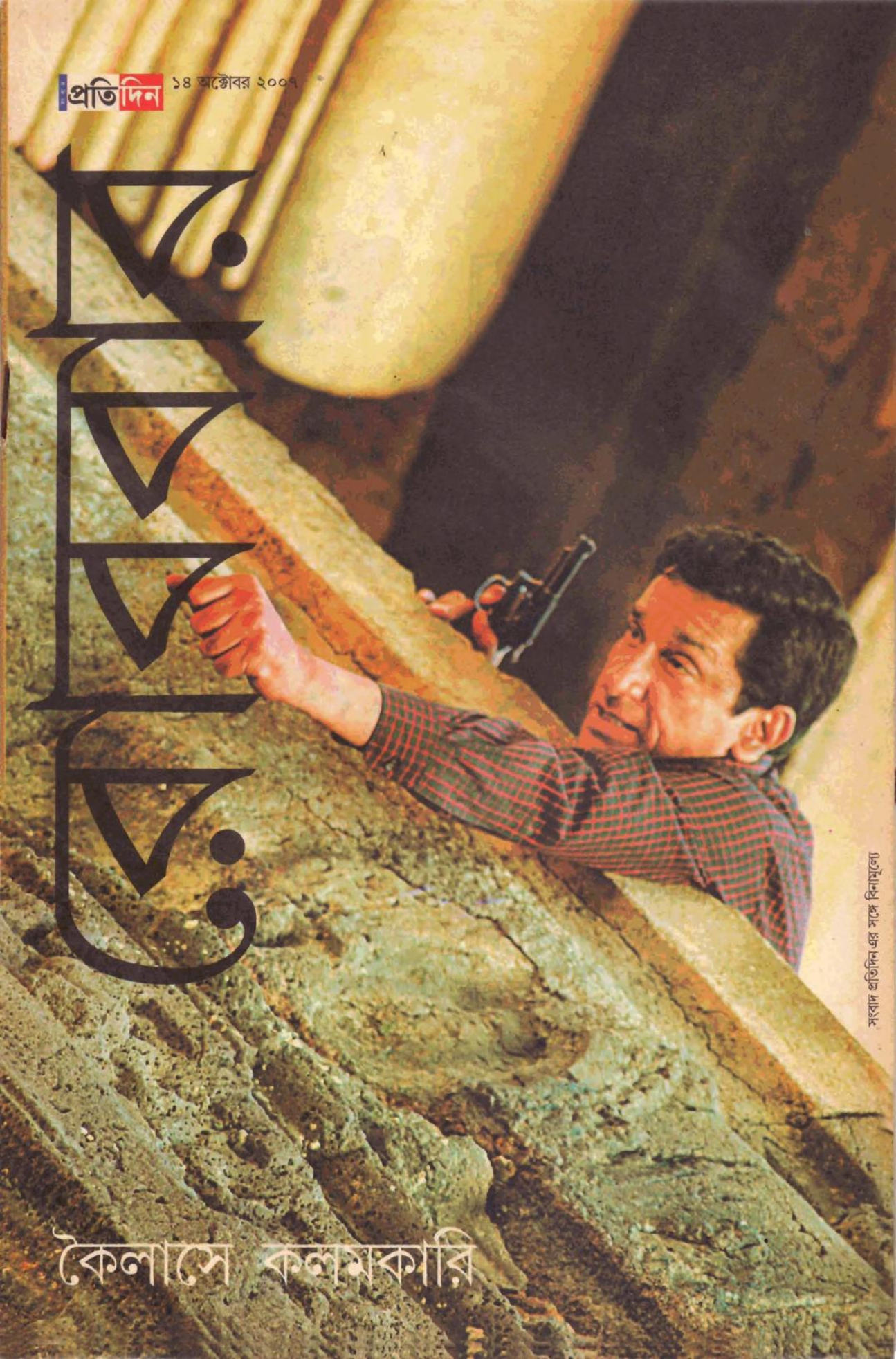

কৈলাসে কলমকারি

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আতিবালের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

পাগল করা পূজো সেল !!

এবার পূজোয় অঞ্জলি জুয়েলার্স দিচ্ছে আপনার পছন্দের গয়নার উপর

৫০% পর্যন্ত মজুরীতে বিশাল ছাড়। সঙ্গে আরো আকর্ষণীয় উপহার !

অফারটি ১৮ই অক্টোবর ২০০৭ পর্যন্ত প্রযোজ্য।

: দোকান খোলা :

সোমবার থেকে রবিবার প্রতিদিন

সকাল ১০.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত

অঞ্জলি জুয়েলার্স™

সবার জন্য

প্রতিদিন লাকি ড্র

Gift Voucher

জিতে নিন

সাপ্তাহিক বাম্পার ড্র

২০টি টিভি

২০টি রেফ্রিজারেটার

২০টি মোবাইল

২০টি মাইক্রো ওভেন

গোলপার্ক ঃ২৪৪০ ১৭৯২ • সল্টলেক ঃ বি ই ১০১,২৩২১ ২০৫৭ • বেহালা ঃ ২৪৪৫ ৫৭৮৪

সল্টলেক ঃ এইচ এ ৩, সেক্টর ৩,২৩২১ ৮৩১০ • শোভাবাজার ঃ ২৫৩৩ ৫৮৩২ / ৫৮৩৪

এছাড়া আমাদের আর কোন শো - রুম নেই

www.anjali.bz

১৪ অক্টোবর ২০০৭

রোববার

লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ১২

এবার মলাট
কৈলাসে কলমকারি

কেলেঙ্কারির একশেষ
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
তোপসের ডায়রি
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ২২
তোপসের রুকস্যাক
অর্পিতা চৌধুরী ২৮

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৩০

রোববারের মেগা
কলিকাতায় নবকুমার
সমরেশ মজুমদার ৩৪

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৮

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
ভজহরি মান্নার
তোপসে সোনার কেল্লা ৪০

সৌজন্য
মৌ রায়চৌধুরি

প্রচ্ছদ
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিম রোববার
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়
অর্পিতা চৌধুরী
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

লে
লেটারবক্স

খেলা খেলা সারাবেলা

রবিবার-এর অলস সকালে রোববার আমাদের গতানুগতিক জীবনে একটা আলাদা মাত্রা, অভিনব আমেজ এনে দেয়। ১৫ জুলাই 'বউদি' সংখ্যায় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নতুন বৌঠান' প্রচ্ছদকাহিনিটি সত্যিই সেই মাত্রা, অভিনব আমেজকে আরও যেন দ্বিগুণ করে দিল। কাদম্বরীদেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণয়কাহিনি আমাদের অনেকেরই জানা। কিন্তু তাঁদের প্রণয়রসের মাধুর্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভাবাবেগ, এক নির্মম আকুতি, নির্লোভ কামনা, মিষ্টি সরলতার কথা—আমাদের অনেকেরই অজানা। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরীদেবীকে চেনে না। যারা চেনে তারা সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'র 'চারু'কে চেনে। রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনুর মতো পরিচিতি এ প্রেমে নেই। কিন্তু যা রয়েছে তা পাঠককে অন্য এক মাত্রায় আকর্ষণ করে। বসন্তের এক দুপুরে শিলাইদহে যাত্রাকালে প্রেমের উদ্দেশে কবিগুরু বলেছিলেন—'জীবনে প্রেম অনেকবার আসে। কিন্তু প্রথম প্রেমের ভাবাবেগ, মাদকতা, মূর্ছনা সারাজীবন হৃদয়ের এককোণে নীরব অক্ষরের মতো থেকে যায়। সংসারের কঠিন জাঁতাকলও সেই অক্ষরকে পিষ্ট করতে পারে না। আর আমার জীবনের সেই নীরব অক্ষর আমার নতুন বৌঠান।' সত্যিই নীরব অক্ষরই ছিল সে প্রেম। সেই প্রেমে কামনা ছিল, সংযত ভাষা ছিল, ছিল মৃদু উষ্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কবিগুরু নিজে বলেছিলেন, 'এমন প্রেম ছিল সে যুগে বিরল'। সে যুগে কেন, বর্তমান কঠিন বাস্তবের এই যুগেও ওরকম প্রেম সত্যিই বিরল। রঞ্জনবাবু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এমন একটি লেখা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

কৃষ্ণকলি মুখার্জি
কলকাতা-২৯

নিষিদ্ধ প্রণয়

১৫ জুলাই 'এবার মলাট' কলামে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নতুন বৌঠান' লেখাটি অনবদ্য। বহুপঠিত, বহুচর্চিত এবং অবশ্যই সর্বজনবিদিত এক কাহিনিকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠককুলের সামনে হাজির করেছেন। প্রশ্ন হল, এটা কি ভালবাসা? আসলে ভালবাসা যেমন দুর্ঘটনার মতো জীবনে আসে তেমনি আবার কারও কারও জীবনে পথ চলতে চলতে ভালবাসা কখন যে তার সহযাত্রী হয়ে যায় সে টের পায় না। তেমনি রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর সম্পর্ক। সমাজ নিষিদ্ধ প্রণয় আখ্যা দিলেও ভীষণ আকর্ষণীয় লাগে সেই প্রণয় থেকে সৃষ্ট রবীন্দ্র রচনাগুলো। সব সম্পর্কের উর্দ্ধে উঠে এই প্রেম আমাদের জীবনে যে দর্শনের উপহার দিয়েছে তা আমাদের অবশ্যই ভাবা উচিত। আসলে অবহেলিত অনুকম্পিতদের মধ্যে কত বিশাল ভালবাসা লুকিয়ে থাকে তা লেখক যেন বারে বারে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে বলি রঞ্জনবাবুর কলম যেন পাঠকের রোববার পড়ার খিদেটা দিনদিন আরও বাড়িয়ে দেয়।

পল্টু ভট্টাচার্য
হাওড়া

চিন্তাশীল লেখা

১৫ জুলাই-এর রোববার-এ রঞ্জনবাবুর লেখা 'নতুন বৌঠান' পড়লাম। ওনার লেখা যেখানেই পাই পড়ি। ভাল লাগে ওনার চিন্তাশীল লেখা। তবে কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে তিনি যা লিখেছেন তার সঙ্গে সহমত হতে পারলাম না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে তো গোটা ভারত মাতোয়ারা। এই বয়সে এসে প্রেমের এক অন্য অর্থ দেখতে পেলাম। রাধা আয়ানের স্ত্রী। তিনি কোনওদিন রাধার চরিত্র নিয়ে অভিযোগ তোলেননি। অর্থাৎ রাধার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ছিল। তবে কেন কৃষ্ণপ্রেম? উত্তর পেলাম।গোপিনীবেষ্টিত কৃষ্ণকে তিনি উদ্ধার করে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এদিকটা নিয়ে কখনও আলোচনাই হয়নি। শুধু প্রেম আখ্যান রচনা হয়েছে। এই আঙ্গিকেই নতুন বৌঠানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম দেখতে ইচ্ছে করে! 'পরকীয়া' কথাটির মধ্যে একটা অশুচিভাব আছে। তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

স্পর্শ করতে পারে বলে মনে হয় না। তিনি সত্যের প্রতীক। সব সত্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন। নতুন বৌঠানের যে চোখ তিনি ভুলতে পারেননি সারাজীবনে, সত্যিই সে চোখ অপার বৈশিষ্ট্যের। ওই চোখে তিনি 'ঠাকুরপো'র। রবীন্দ্রনাথের হিমালয়সদৃশ প্রতিভাকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তাই প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার জন্য যা যা করার তাই করেছেন। আশ্চর্য লাগল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থন। সেই আয়ানের মতোই। তবে দুটি নারী চরিত্রের অনেক তথ্য আপনার লেখায় পেয়ে ভাল লাগল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কম প্রতিভাবান ছিলেন না। কিন্তু সব কি প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানদানন্দিনীর সান্নিধ্যে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ণিমার চাঁদের মতো পূর্ণ প্রকাশিত।

অপর্ণা মুখার্জি
হুগলি

অন্দরমহল

কী করেছেন ঋতুদা! ক্রমশ সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠা একটা পত্রিকার বিষয় 'বউদি'—ভাবা যায়! রকবাজি এতদিন রকে ছিল। আপনি এবার এটা একেবারে অন্দরমহলে ঢুকিয়ে দিলেন? এ তো সহ্যের বাইরে! ভাল ঠাকুরপো দেবজ্যোতিদার 'বউদিবাজি' তো কাউকেই বাদ দেয়নি! কুন্তী, সীতা, দ্রৌপদী, ফ্যানি ব্রাউন—যাকে বলে ঘনঘন 'স্ট্যান্ডবাই' লেখা—আপামর বাঙালির বউদিপ্রেমের আপটু ডেট সানডে স্যান্ডুইচ! খেলেও পস্তাতে হবে আবার না খেলেও। সেইসঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথ আর কাদম্বরীর কথা। যেন আগুনে ঘি—'পাগলা, খাবি কী রে ভাই, ঝাঁঝে মরে যাবি!' এরকম একটা সংখ্যা করতে গেলে শুধু বিদ্যে, বুদ্ধি, পদ থাকলে হয় না। অনেক সাহস লাগে। বিশেষ করে—'ধরিব মাছ না ছোঁব পানি'-এর বঙ্গদেশে, বঙ্গসমাজে। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই

দেব মাইতি
হাওড়া

অশিক্ষিত ভাষা

১৫ জুলাই রোববার-এ দেবজ্যোতির লেখা 'বউদিবাজি' যৌনতা সম্পর্কিত লেখা। এর আগে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন 'নতুন বৌঠান'। কিন্তু সে লেখার মধ্যে ছিল ভাষার বুনট, ভাষা প্রয়োগের সচেতনতা। রকবাজ ও বস্তি এলাকার যৌনতাসংক্রান্ত অশিক্ষিত ভাষা প্রয়োগকে ছাপার অক্ষরে হুবহু তুলে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? বিয়ের পর একজন দম্পতি রাতে দরজা বন্ধ করে কী করতে পারেন, সে বিষয়ে বাড়ির প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু বন্ধ দরজার ভিতরের বিষয়টি সর্বসমক্ষে তুলে দেওয়ার মধ্যে কোনও আধুনিক মনের পরিচয় ঘটে কি না জানি না বরং তার মানসিক অসুস্থতার পরিচয় হয়তো বহন করে! দেবজ্যোতির লেখার একটি অংশ কেবলমাত্র তুলে ধরতে চাই।...'মিত্তিরবাড়ির মাধবডাক্তারের বউ হঠাৎ মাতঙ্গিনী হয়ে—মিচকি স্মাইল মেরে—একটা লুজ বল দিলে—সে রাত, আপনাহাত জগন্নাথ—দমাদ্দম দমাদ্দম ঢিশ—ইশ!'...

পুনরায় অনুরোধ করছি। এই ধরনের লেখককে রোববার-এ এরকম ভাষা লেখার সুযোগ দেবেন না। রোববার দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যত্রতত্র বাড়িতে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে থাকে। এতে ছোট বড় সকলের কাছেই সুস্থ মানুষেরা বড় অস্বস্তি বোধ করে।

স্বপ্নেশ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৮৪

মায়ের সমতুল্য

১৫ জুলাই রোববার-এ দেবজ্যোতির লেখা 'বউদিবাজি' পড়লাম। দেবজ্যোতির লেখার হাত বেশ ভাল। অনর্গল কথার মারপ্যাঁচে সমগ্র রচনাটি এক অনাবিল হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষটায় সে যেন দিশা হারিয়ে ফেলেছিল। কার সঙ্গে ঠাট্টা করা যায়, কাকে সম্মান দিতে হয়—সবই যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তার। 'বউদিবাজি'তে লিখেছে 'ভাবি মা কি সমান হোতি হ্যায়।' যদিও শব্দটা 'ভাবি' নয় 'ভাভী'। তবুও সে যদি বউদিকে মা মনে করে সম্মান দিয়ে কিছু লিখত তবে অনেক ভাল হত। তার বাড়িতে কি বউদি নেই? তার এই লেখা পড়ে সব বউদিদের কেমন লাগবে? যেভাবে বউদিদের চিহ্নিত করে তাদের নিয়ে ছ্যাবলামি করে, কেচ্ছা করে, তাদের চেহারা, সোনালি ঠোঁট ইত্যাদি নিয়ে লিখেছে—তা একজন লেখকের কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি না।

লিখতে লিখতে দেবজ্যোতি কাউকেই বাদ দেয়নি। এমনকী বিখ্যাত কবি কিটসকেও ছাড়েনি সে। তাঁর চরিত্রের এই সমালোচনা করার কি খুব প্রয়োজন ছিল?

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'নতুন বৌঠান' নিয়ে লিখেছেন। তিনি কাদম্বরীকে নিয়ে কী সুন্দরভাবে তাঁর মনের ভাবকে প্রকাশ করেছেন! তাঁর লেখার মধ্যে এইসব নোংরামির লেশমাত্র নেই। সুন্দর গম্ভীর লেখা। আমার অনেক বয়স হয়েছে। ঋতুপর্ণকে অনুরোধ, বউদি যদি মায়ের মতোই হয় তবে বউদিদের নিয়ে এইসব কেচ্ছাকাহিনি বন্ধ করুন।

কমলা গোস্বামী
হাজারিবাগ, ঝাড়খণ্ড

অলক্ষ উপস্থিতি

১৫ জুলাই-এর 'ফার্স্ট পার্সন'-এ প্রয়াত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নতুন করে ফিরে পেলাম। অন্তর্লীন ভালবাসার অন্তহীন পরশ। 'চৌরঙ্গী' ছবির শঙ্করের মধ্যে, বাঙালি মন খুঁজে পেয়েছিল তার নীরব অভিব্যক্তিকে। যে দেখে বেশি, বলে কম। যে খুঁজে বেড়ায়, পেয়ে হারায়। যে নিজের তারে নিজের যন্ত্রণাকে বাঁধে। নিজের ভিতর দিয়েই নিজেকে দেখে। মধ্যবিত্ত পুরুষ, অভিনেতা শুভেন্দুর ভিতর নিজেকে আইডেনটিফাই করে। শুভেন্দুর সুকুমার আয়নায় নিজের প্রেম, সারল্য, হতাশাকে চিনতে, জানতে শেখে। 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' মূলত হাসির ছবি হলেও শুভেন্দু-লিলি চক্রবর্তীর প্রেম, খুনসুটি, পালিয়ে বিয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্তর এলোমেলো বাজনা, বাঁধনহীন উচ্ছ্বাসকে একটা সবিশেষ মাত্রা দান করে, ছবিকে অন্য স্তরে উন্নীত করে। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় চলচ্চিত্র অঙ্গনকে শূন্য করে গেলেও তাঁর অলক্ষ উপস্থিতি অমলিন হয়ে থাকবে।

হীরালাল শীল
কলকাতা-১২

চিঠি পাঠাবার ঠিকানা
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
ই-মেল
robbar.pratidin@gmail.com
ফ্যাক্স : 22127977

ফা
ফার্স্ট
পার্সন

(প্রথম কিস্তি)

সেপ্টেম্বর ৮, ২০০৭। শনিবার।

দুপুর বারোটা নাগাদ ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্স-এর একটা ছোট্ট প্লেন-এ টরোন্টো রওনা দিলাম আমি আর যিশু।

গত দুটো দিন ওয়াশিংটন ডিসিতে ভালয়-মন্দয় কেটে গেল। ছ'তারিখে ভারতীয় ছবির একটা উৎসবের উদ্বোধন হল 'দোসর' দিয়ে। সাত তারিখ সকালবেলাটা অল্প একটু বেড়ানোর সময় পেয়েছিলাম। আসলে ন্যাশনাল মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট আমার ছবির একটা রেট্রোস্পেকটিভ করতে চায়। সেটা নিয়ে একটা মিটিং ছিল।

ভাগ্যিস, যিশু সঙ্গে ক্যামেরা এনেছে। আমি তো ছবি তুলতেও পারি না, ফলে সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মাঝে মাঝে ভাবি, কতগুলো দেশ বেড়িয়েছি—সত্যি যদি কতগুলো ছবি অন্তত তোলা থাকত!

টরোন্টো এসে পৌঁছলাম বিকেল তিনটে নাগাদ।

এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য টরোন্টো ফেস্টিভ্যাল-এর তরফ থেকে পাঠানো শাটল লিমো অপেক্ষা করছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল-এর পথ তিরিশ মিনিটের। পথে ডানদিকে অন্টারিও লেক-এর একটা ঝলক দেখতে পেলাম।

বিদেশে বেড়ানোর যে জিনিসটা আমার সবথেকে খারাপ লাগে, সেটা হল আমার নিজের লাগেজ-বাতিক। যতগুলো জামাকাপড় আসলে পরি, তার দ্বিগুণ পরব বলে ঠিক করি, আর সঙ্গে নিয়ে যাই তারও দ্বিগুণ। এবং প্রত্যেকবার এর হাতে পায়ে পড়ে 'আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে যাবি, প্লিজ?' বলে কাকুতি মিনতি করে, বন্ধুবান্ধবদের ভর্ৎসনা আর নিজের নাক-কান মোলা প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও বাইরে যাওয়ার আগে স্যুটকেসটা আমার সঙ্গে একটা স্বভাবসিদ্ধ বেইমানি করে কেমন যেন অতিকায় হয়ে ফুলে ওঠে।

ওয়াশিংটন চেক ইন কাউন্টারে বেশ সদয় ধরনের এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা ছিলেন। তাঁর দাক্ষিণ্যে আসার সময়ে তেমন কোনও বেগ পেতে হয়নি।

দেশে কাজের লোকেদের কল্যাণে আমরা আসলে যে কতটা ঠুঁটো এবং পঙ্গু, সেটা বাইরে বেরলে পদে পদে টের পাই।

কারণ এয়ারপোর্ট থেকে বেরলেই চিরাচরিতভাবে আমার ড্রাইভার গোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে না, যে ট্রলিটা এবার তার হাতে দিয়ে দিলেই নিশ্চিন্তি।

বিশেষ করে আরও লজ্জা করে, যখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গেলে বিমানবন্দরের ফেস্টিভ্যাল কাউন্টার-এর অভ্যর্থনাকারিণীরা আমার ভারি ভারি স্যুটকেসগুলো নিয়ে গাড়িতে তোলেন এবং নিশ্চয়ই বিভিন্ন সময়ে, পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ভাষায় আমার মুণ্ডুপাত

করেন— আমি বুঝতেও পারি না।

বা, বুঝতে পারলেও একেবারে না বোঝার ভান করে মুখে এমন একটা স্মিত হাসি ধরে রেখে দিই, যেন সত্যি ওদের দেশে পা রেখে আমি ওদের কৃতার্থ করেছি এবং ওদেরও যেন প্রায় মেমসাহেব মহিলার মতো আমার এই পুণ্য পাদস্পর্শের আজীবন চাতক প্রতীক্ষায় বসে থাকারই কথা ছিল।

ভাগ্যি ভাল গাড়ির ডিকিতে সব মালপত্র সহজেই ধরে গেল।

এমনকী আমার গাবদা স্ট্রোলিব্যাগ এবং যিশুর ডাফেল ব্যাগটাও।

গাড়ির ভেতরটা পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম। কালো দামি চামড়ার সিট কভার। সিটব্যাক-এ ম্যাগাজিন রাখা রয়েছে—Fashion, People ইত্যাদি।

ড্রাইভারের নাম, গাড়ির নম্বর কিছুই জেনে নিলাম না। আফশোস হচ্ছে।

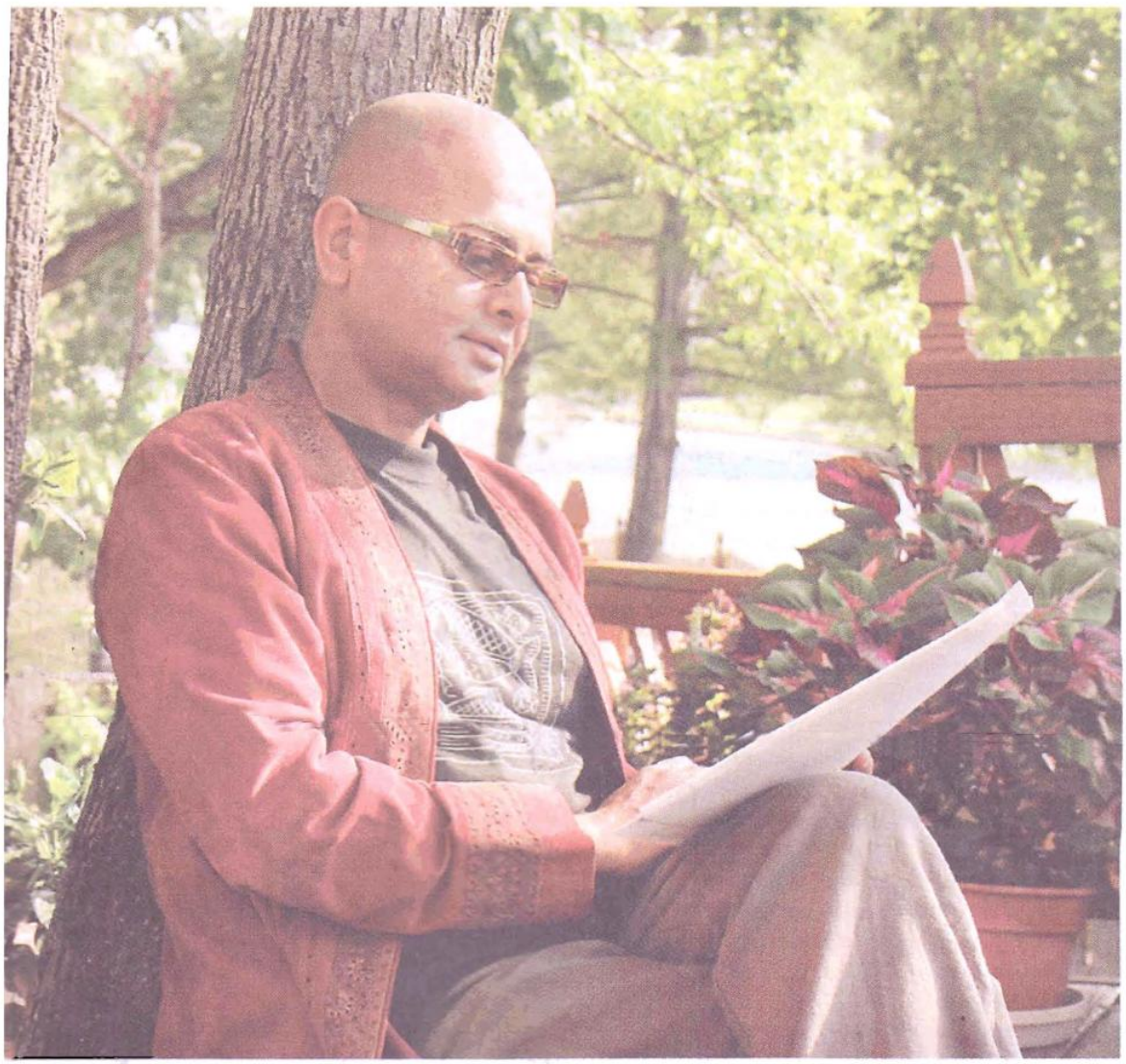

ওয়াশিংটনে মঞ্জুলার বাড়ির বারান্দায়। একটু পরেই টরোন্টো রওনা দেব। যিশুর তোলা

গত কয়েকদিন ধরেই টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অভ্যাগত সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে।

এয়ারপোর্ট-এ একটা আলাদা ফেস্টিভ্যাল কাউন্টার। সেখানে TIFF বোর্ড লাগানো। এবং উৎসবের ব্যাজধারী দু'জন মহিলা অপেক্ষা করছেন। উৎসব সংশ্লিষ্ট যে যাত্রীই নামছেন, তাঁর প্রথম যোগাযোগ-জায়গা ওই অভ্যর্থনা কাউন্টারটি।

বুম্বা আর অর্পিতা পরশুদিনই এসেছে। বুম্বা দ্য লাস্ট লিয়র-এ ছোট্ট একটা পার্ট করেছে বটে, কিন্তু ফেস্টিভ্যাল-এ ওর আমন্ত্রণ বুদ্ধদার (বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত) ছবি 'আমি ইয়াসিন ও মধুবালা'র অন্যতম নায়ক হিসেবে। অর্পিতা সঙ্গে এসেছে বেড়াতে। বুম্বাকে এস এম এস করলাম। ওরা কোন হোটেল-এ আছে, জানতে পারিনি এখনও বুম্বা এসএমএস গুলোর উত্তর দিচ্ছে না কেন জানি না! পাচ্ছে না বলে? আমি তো ডেলিভারি রিপোর্ট পাচ্ছি।

বুম্বার সঙ্গে মধ্যে কথা হচ্ছিল শীতকালে যদি সাহেব বিবি গোলাম ছবিটা করা যায়।

বেশ কয়েকজন প্রযোজক উৎসাহ দেখাচ্ছেন। বুম্বার সঙ্গে একজনের কথাবার্তা মোটামুটি অনেক দূরই এগিয়েছে। আর আমারও মনে হচ্ছে, সত্যি, কতদিন বাংলা ছবি করি না।

গত দু'মাস প্রায় আমি বম্বেতে। মাঝে দু'তিন দিনের জন্য হয়তো বা কলকাতায় এসেছি। বুম্বা ওর নিজের শ্যুটিং-ডাবিং নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ফলে ফোনেও যে খুব ভাল করে কথা হয়েছে, তা নয়। আমরা ঠিক করেই রেখেছিলাম, টরোন্টোতে গিয়ে যখন দেখা হবে, তখনই না হয় এটা নিয়ে একটু ডিটেলে আলোচনা করব।

পিরিয়ড ছবি করার ঝামেলাটা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। ভাগ্যিস 'চোখের বালি'র সময়ে তিন বছর ধরে আঁতিপাতি করে অনেকটা কাজ করেছিলাম। আসলে ভিজ্যুয়াল রিসার্চ জিনিসটা ছবি বানানোর জন্য যতটা

গুরুত্বপূর্ণ, তার হদিশ পাওয়া ততটাই দুষ্কর।

লন্ডনে যেমন দেখেছি শতাব্দী তো বটেই, প্রায় প্রতিটি দশক ধরে কীভাবে ব্যবহার্য সামগ্রীর চেহারার বিবর্তন ঘটেছে—তার অবিকল অনুকৃতি পাওয়া যায়। আমাদের এখানে এমন অমূল্য সাহিত্যভাণ্ডার সত্ত্বেও দৃশ্যমান বস্তুতালিকার যে কী অভাব, আর সঠিক নমুনা পাওয়া গেলেও বাংলা ছবির বাজেটে তাঁর পুনর্নির্মাণ প্রায় অসম্ভব—সেকথা চোখের বালি করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।

'সাহেব বিবি গোলাম'-এ একটা অন্য সমস্যা আছে। গুরু দত্তের হিন্দি ছবিটার কল্যাণে 'সাহেব বিবি গোলাম' নামটা যেন উপন্যাসের মলাট থেকে লাফিয়ে উঠে সিনেমার ক্রেডিট টাইটেল-এ চিরতরে আটকে গিয়েছে।

এটা যে আদতে একটা মূল উপন্যাস, সেই সময়ের পড়তি জমিদারির এক অনবদ্য দলিল, সেই সত্যটাই যেন সাদা কালোর দুই মায়ানায়িকা মীনাকুমারী আর ওয়াহিদা রেহমানের বাঙালি আঁচলের আড়ালে কেমন করে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে, আমরা ভাল করে বুঝতেও পারি না।

ছবিটা করতে গেলেই ষাটের দশকের সেই মায়াবী সৃষ্টি আজও দর্শক আর আমার মাঝখানে অনড় দেওয়ালের মতো এসে দাঁড়াবে। সেদিক থেকে 'চোখের বালি'র একটা সুবিধে ছিল। সতু সেন-এর বানানো পুরনো ছবিটা আমরা কেউ দেখিইনি প্রায়। ফলে যেটুকু ঝগড়া বিবাদ পুরোটাই ওই দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবিটার অনেকটা আবেদনই বোধহয় ক্যামেরার বাইরের প্রণয়পুরাণটুকু। তরুণী ওয়াহিদা রেহমানের জন্য গুরু দত্তর বিধ্বংসী প্রণয়, এবং ফলত স্ত্রী গীতা দত্ত'র ক্রমে মদ্যপানের শুরু, মীনাকুমারীর নিজের সুরালাঞ্ছিত জীবনের বেদনার ইতিহাস—এতগুলো রসায়নই বোধকরি আজ 'সাহেব বিবি গোলাম'কে এক অমর আইকন করেছে।

ফলে আজ ওই ছবিটা আবার বানাতে গেলে এই ইতিহাসটুকুও যেন আখ্যানভুক্ত হতে চায়।

কেমন হয় যদি গল্পটা আসলে এমন এক পরিচালকের হয় তিনি আদতে ছোটবাবু? একজন নবাগত অভিনেতার হয়, সে আসলে ভূতনাথ! পটেশ্বরী হয়তো বা পরিচালকের নিঃসঙ্গ স্ত্রী, স্বামীর জন্য যার অনেক অপেক্ষার ইতিহাস আজ কেবল এক তরল আস্বাদের সান্ত্বনা। সেই নবাগতর এক নবীনা প্রণয়িনী যে এই সামন্ততান্ত্রিক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পঙ্কিলতার বাইরে—শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা এক নতুন জবা।

এর পাশাপাশি না হয় মূল কাহিনিটাও চলল। একই অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে। অনেকটা 'দ্য ফ্রেঞ্চ লিউট্যানেন্টস উওমেন'-এর অবয়বের মতো।

তাহলে, নতুন করে একটা 'সাহেব বিবি গোলাম'ও হয়। পুরনোটার সঙ্গে অবধারিত তুলনাও হয় না, আর উপন্যাসের ঐতিহাসিক কলেবরটাকে সঙ্কুচিত করার শৈল্পিক দ্বিধারও একটা সহজ অবসান ঘটে।

ভাবনাটা দু-একদিন হল মাথায় ঘুরছে। বুম্বার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতে ভাল হত। ভাবছিলাম, এখানে এসে দেখা তো হবেই—তখনই কথা বলে নেব না হয়।

গাড়িটা আমাদের পৌঁছে দিল রয়্যাল ইয়র্ক হোটেলে। আপাতত বারো তারিখ অবধি টরোন্টো শহরে এটাই আমাদের আস্তানা।

রয়াল ইয়র্ক হোটেলটা শহরের পুরনো অভিজাত একটা হোটেল। অনেকটা আমাদের গ্র্যান্ড হোটেলের মতো।

সাবেকি পাশ্চাত্য স্থাপত্য, বিশাল একটা লবি, অতিকায় ঝাড়লণ্ঠন ঝোলানো। শ্বেতপাথর, গ্র্যানাইট, দামি মেহগনির প্যানেল, ধ্রুপদী আসবাব আর নক্সাদার কার্পেটে মোড়া।

একবার টার্নস্টাইল দিয়ে লবি এরিয়াতে এসে ঢুকলে দিন বা রাত বোঝার কোনও অবকাশ নেই।

জানা গেল, অমিতাভ বচ্চন এই হোটেলে থাকতে চেয়েছিলেন। ফলে 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর গোটা টিমটাকেই এখানে তোলা হয়েছে।

আমার আর যিশুর ঘর সেভেনথ ফ্লোর-এ। ১৮৮ নম্বর

ফরাসি শাসনের সব চিহ্ন এখনও ক্যানাডা দেশটা থেকে চলে যায়নি। এয়ারপোর্টে দেখলাম সব নির্দেশিকাই ইংরেজি এবং ফরাসি দুটো ভাষায়। আমাদের ঘরেও অন্দরসজ্জা দেখেও অভিজাত ফরাসিয়ানার কথাই মনে হল।

ঘরের দেওয়ালটায় গোলাপী ফুল ফুল ছাপ ওয়ালপেপার। দুটো টুইন বিছানার মাথায় এক একটা স্টিল লাইফ পেইন্টিং। আমার মাথার ওপর ন্যাসপাতি, যিশুর মাথায় লিচুর থোকা। অফ হোয়াইট প্লিটেড শেড-এর একটা বার্গান্ডি ল্যাম্প দুটো বিছানার মাঝে একটা বেডসাইড টেবিলের ওপর জ্বলছে। মেঝেতে গোলাপি রাস্ট কার্পেট। ঘন পালিশ করা ফার্নিচার, একটু সাবেকি। সবুজ আর অফ হোয়াইট-এর নক্সাবোনা গদি দেওয়া পুরনো দুটো চিপেনডেল চেয়ার। লেখার টেবিলের সামনের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমের আয়না। তার পাশে টিভি ক্যাবিনেট।

ঘরে ঢুকেই টিভি চালিয়ে দিল যিশু। কোথায় বাঙালির ছেলে, হাতমুখ ধুবি, পায়ে জল দিবি, না জুতো পরা পা নিয়ে সটান উঠে পড়ল বিছানায়। ঠায় তাকিয়ে রইল টিভির দিকে, আর চোখের কোণ দিয়ে সমানে আমাকে বলে গেল 'একটু খাবার অর্ডার করো না ঋতুদা, খুব খিদে পেয়েছে।'

টিভিতে 'ডোন্ট ফরগেট দ্য লিরিকস' বলে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনেকটা কে বি সি-র মতোই, মানে ধাপে ধাপে পুরস্কারমূল্য বাড়বার প্রতিযোগিতা।

খেলাটা মজার। আদতে একটা গানের অনুষ্ঠান। প্রতিযোগীরা সঙ্গীতপ্রিয়, এবং যাবতীয় গান শোনার অভ্যেস আছে। আমাদের অন্তাক্ষরী অনুষ্ঠানে যেমন হয় অনেকটা তেমনই।

মজাটা হচ্ছে, প্রতিযোগীকে তাঁর পছন্দমতো গানের শ্রেণি বেছে নেওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়। ধরা যাক—আমাদের ভাষায় রবি ঠাকুর, নজরুলগীতি, আধুনিক গান, জীবনমুখী গান, বাংলা সিনেমা বা বাংলা ব্যান্ড। এবার যে যার পছন্দসই গোত্র বেছে নিলে, সেই গোত্রের কোনও একটা গান বাজানো হয়। প্রতিযোগী সঙ্গে গলা মেলান, আর পর্দায় গানের বাণীটুকু ফুটে

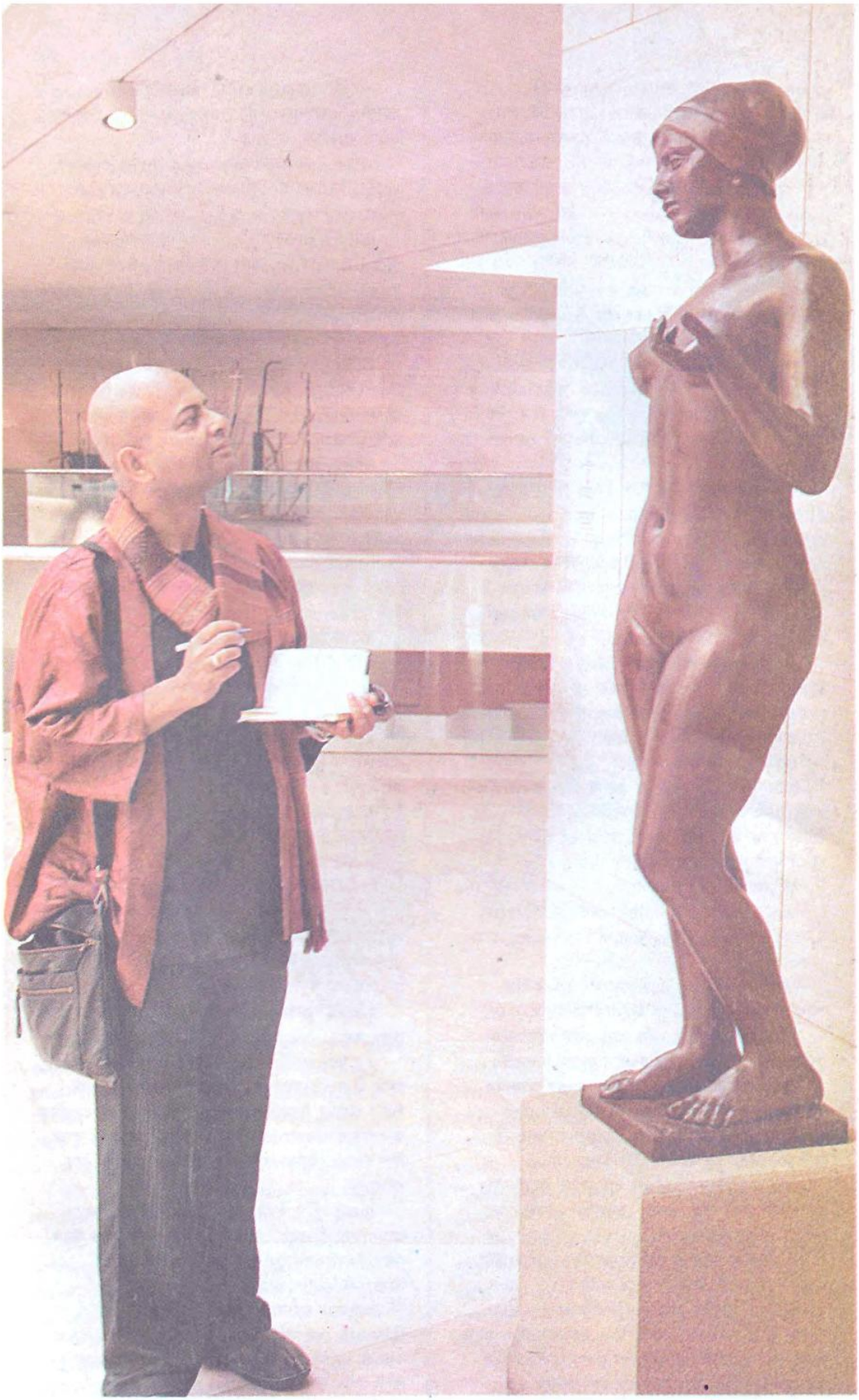

ওঠে। হঠাৎ কোনও একটা জায়গায় এসে গানের কয়েকটি শব্দ উধাও হয়ে যায়। পর্দার পংক্তিতে ড্যাশচিহ্ন পড়ে। প্রতিযোগীকে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়।

এইভাবে সহজ থেকে কঠিন, অল্প কথা থেকে গোটা স্তবক—যিনি যতটা নিঁখুতভাবে তাঁর স্মৃতি থেকে পূর্ণ করতে পারেন, তাঁর পুরস্কারমূল্য তত চড়চড় করে বাড়ে।

আমাদের চোখের সামনেই এক শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী পঞ্চাশ হাজার ডলার জিতলেন, আর এক কৃষ্ণাঙ্গ প্রৌঢ় এক লহমায় দুই মিলিয়ন ডলার ধনী।

আর আমরা, দুই বঙ্গসন্তান, অমনি সেটাকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করে এক বিশাল আনুমানিক বৈভবের হিসেব করে ফেললাম যা দিয়ে চাইলে যিশু গোটা টরোন্টো এয়ারপোর্টের, সবকটা ডিউটি ফ্রি দোকান কিনে ফেলতে পারত।

ঘরে আমার জন্য রাখা ছিল একটা ফেস্টিভ্যাল কিট। তাতে ফেস্টিভ্যাল-এর আনুষ্ঠানিক ব্রোশিওর-এ 'দ্য লাস্ট লিয়র'-এর একটা সুন্দর ছবি দিয়েছে। মুসৌরিতে তোলা একটা দৃশ্যের। ছবিতে অমিতদা আর প্রীতির পেছনে মেরুন সোয়েটার পরা যিশুর চেহারা উঁকি মারছে।

পাতাটা যিশুর দিকে এগিয়ে দিলাম। যিশুর ফর্সা মুখটা যেন আরও একটু উজ্জ্বল দেখাল।

ছবি ছাড়াও ফিল্মের সারাংশ, ফিল্মের বিষয়ে টরোন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একটা ছোট লেখা (প্রধানত অমিতদার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে) এবং শিল্পী এবং কলাকুশলীদের একটা তালিকা। সেখানেও যিশু সেনগুপ্ত নামটা জ্বলজ্বল করছে।

যিশুর নাকি কোনও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আসা এই প্রথম। এবং আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যাল-এ, বিদেশে তো বটেই। দেখা যাক, এই ফেস্টিভ্যালটা ওর ওপর সত্যি সত্যিই কোনও আলোছায়া ফেলে কিনা!

ক্যাটালগে দেখলাম বুদ্ধদার ছবির ইংরেজি নাম 'The Voyuers'। বুম্বা আর অমিতাভর একটা ছবি দিয়েছে। আদুরের ছবির নাম 'Four Women'। সঙ্গে নন্দিতার ছবি দেখলাম।

হোটেল-এর ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। যাক, 'পাখা' 'পাখা' করে কাউকে জ্বালিয়ে মারতে হবে না।

অমিতদা আর প্রীতি নাকি প্রায় একই সঙ্গে লন্ডন থেকে রওনা হয়েছেন। এবার এসে যাবেন নিশ্চয়ই।

ঘরের ফোনটা বাজল। ফেস্টিভ্যাল-এর সিলেক্টর ক্যামেরন বেইলি। ও আমাদের হোটেল-এ আসছে সন্ধেবেলা, সাড়ে সাতটা নাগাদ। কালকের অনুষ্ঠানটা নিয়ে সকলের সঙ্গে একটা মিটিং করতে চায়।

হোটেলের ঘরের জানলার বাইরেটায় হোটেলটার অন্যদিকটা দেখা যায়। একটা দেওয়ালে কেবল বেলা শেষের পশ্চিমে রোদ।

ওয়াশিংটন ডিসিতে তো সন্ধে হচ্ছিল প্রায় আটটা নাগাদ। এখানে কখন সূর্য ডোবে জানি না!

জানলায় পাতলা সাদা স্বচ্ছ পর্দা লাগানো। তার দুপাশে ভারি পর্দা এবং পেলমেট-এ ভ্যালেন্স; গাঢ় সবুজ পাতা, আর গোলাপি ফুলের নক্সা করা। আলাদা করে পর্দাগুলো হয়তো ভাল নয়, তবে সব মিলিয়ে এই সাবেকি হোটেল ঘরটার সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। যিশুকে বলছি কয়েকটা ছবি তুলে নিতে। অন্তত কোনও একটা চেহারা মনে থেকে যাবে।

আগামিকাল দুপুর একটা নাগাদ আমাদের ছবির প্রিমিয়ার। ছবিটা গালা সেকশন-এ আছে বলে বেশ ধুমধাম করে একটা রেড কার্পেট-এর ব্যবস্থা হয়েছে।

যিশুটা এসে সত্যিই ভাল হয়েছে। টোটার জন্য এখনও আমার খারাপ লাগে। 'চোখের বালি'র সময় কোনও চলচ্চিত্রোৎসবে এল না ছেলেটা। নিজের কাজের প্রশংসাটা জানতেই পারল না নিজে। আমরা বাঙালিরা কতদিন এত ঘরকুনো হয়ে থাকব!

টিভির দিকে মুখ করে বসলে ডানদিকের খাটটা যিশুর। বাঁদিকেরটা আমার। এখন ছ'টা বাজে। বাইরের আলো পড়ে এসেছে। যিশুও এতক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজ সকালে এই সংখ্যার এডিট পাঠিয়ে দিয়েছি অনিন্দ্যকে। 'মাস্টারমশাই' সংখ্যাটার পর 'বন্দিনী' আর 'ভোকাট্টা'—দুটো ফার্স্ট পার্সনই একটু গোঁজামিল হয়ে গেল।

ওয়াশিংটনে মঞ্জুলা বলে এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম আমরা। তার অচল ফ্যাক্স মেশিনকে সচল করে লেখা পাঠানো হল।

সত্যিই, এবার বিদেশে আসার আগে ফার্স্ট পার্সন ছেড়ে দিয়ে আসব। ডেট্রয়েট-এও দেখেছি, এবারও দেখলাম—এই ফ্যাক্স করে এডিট পাঠানোটা বেশ ঝামেলার।

সন্ধে সাতটা নাগাদ ক্যামেরন-এর ফোন এল। ক্যামেরন লবিতে অপেক্ষা করছে। একবার কথা বলতে চায়।

আমার কেমন যেন ধারণা ছিল ক্যামেরন একজন বিশালাকায় গাঁট্টাগোট্টা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। দাড়ি এবং কোঁচকানো চুল।

আমি লবিতে নেমে ক্যামেরনকে মোবাইল-এ ধরার চেষ্টা করছি হঠাৎ দেখি বেশ ছিপছিপে চেহারার দাড়িগোঁফবিহীন নেড়ামাথা একজন মানুষ মোবাইল কানে ভীষণভাবে কাউকে খুঁজছে। আমরা দু'জনে এতটা কাছাকাছি যে প্রায় ধাক্কা খাই আর কী!

দুজনেই দুজনের দিকে তাকালাম। ক্যামেরন আমায় দেখে বলল—ঋতু! আমি বললাম—ক্যামেরন!

এর মধ্যে আমিও রোগা হয়েছি, মাথা নেড়া হয়েছে, চশমা উধাও হয়েছে। ফলে ক্যামেরনের কাছে আমি যতটা অচেনা, আমার কাছেও ও ততটাই। যাক, প্রাথমিক কথাবার্তার মাঝখানেই যিশুর ফেস্টিভ্যাল ব্যাগটা তুলে দিল হাতে। বেচারা কষ্ট করে ব্যাগটা বয়ে বয়ে নিয়ে এসেছে।

ও প্রধানত আগামিকাল গালার স্ক্রিনিং-এর আগে আমরা কে কীভাবে, কে আগে বা কে পরে মঞ্চে উঠব, কে কে দর্শকের সঙ্গে কথা বলব—সেটা নিয়েই আলোচনা করতে এসেছিল।

ক্যামেরন চায় মঞ্চে অর্জুন, প্রীতি, অমিতদা তিনজনেই যেন কথা বলেন। আর বিশেষ করে, কারণ পরবর্তী স্ক্রিনিংগুলোর দিন ওঁরা কেউ এখানে থাকবে না। ফলে দর্শক ওঁদের কথা শুনতে চাইবে।

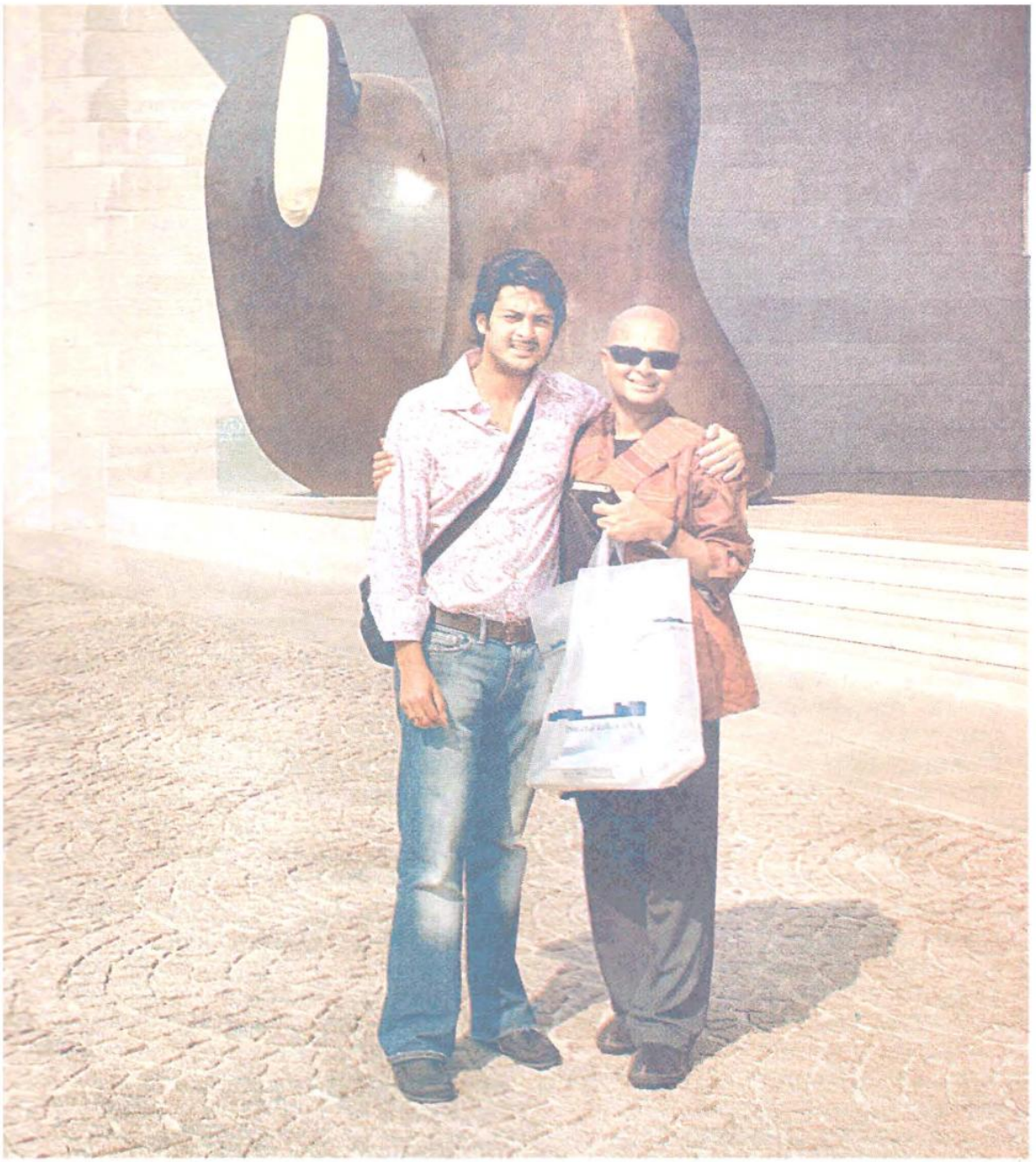

খবর পেলাম অমিতদা আর প্রীতি সবে এয়ারপোর্টে নেমেছেন। টরোন্টো ফেস্টিভ্যাল বুকলেট-এ অমিতদার অভিনয়ের প্রশংসা পড়ে একটা এসএমএস করেছিলাম। দেখলাম এসএমএস-টা সবে ডেলিভার্ড হল। মানে প্লেন থেকে নেমে ফোন চালু হয়েছে।

অমিতদার মেসেজ এল—জাস্ট ল্যান্ডেড।

অমিতদার মধ্যে সত্যিই একটা শিশু আছে। ওই যে এসএমএস করে জানিয়েছি, যে তোমার নামে অফিসিয়াল বুকলেটে খুব ভাল ভাল কথা লেখা হয়েছে—তাই তৎক্ষণাৎ জানা চাই। চটজলদি এসএমএস এল—Driving towards hotel. Will I be able to see the booklet in the hotel?

লিখলাম— নিঃসন্দেহে। অবশ্য শুভ যদি কাছাকাছি থাকে, ওকে বল। ও-ই তোমায় বলে দেবে। তোমার ফেস্টিভ্যাল কিটটা ওরই কাছে আছে।

আমি আর যিশু লবিতে অপেক্ষা করছি। যিশুর আর কোনও দিকে মন নেই। এক মনে ফেস্টিভ্যাল বুকলেটের পাতা ওল্টাচ্ছে। নিজের অভিনীত ছবির সঙ্গে কোনও চলচ্চিত্রোৎসবে আসা যিশুর এই প্রথম। ফলে নিজের ফেস্টিভ্যাল কিটও এই প্রথম। সেই সাত রাজার ধন পরম যত্নে আগলে গভীর মনোযোগে ঘাড় গুঁজে দেখছিল যিশু, এমন সময় লবিতে একটা শোরগোল শোনা গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি টার্নস্টাইল ঠেলে লবিতে ঢুকছে পালে পালে সশস্ত্র প্রহরী। আর সেই ব্যূহবেষ্টনির মধ্যে থেকে উঁকি মারছে একটা লম্বা মাথা। কালো চশমা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ডেনিম জ্যাকেট। রয়্যাল ইয়র্ক-এ পা রাখলেন অমিতাভ বচ্চন।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

নবনীতা দেবসেন

শিশুদের সাহিত্য

পুজো এসে গেল, পুজোর লেখালিখি শেষ, প্রধান পুজোবার্ষিকীগুলি বাজারে এসে গিয়েছে। এবারে কতগুলো ছোটদের পুজোবার্ষিকী বেরুচ্ছে আমাদের বাংলাতে?

ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনাসভাতে, জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনে প্রায়ই ক্ষোভ শুনতে পাই ভারতবর্ষে নাকি শিশু সাহিত্যের বড় অভাব। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনি ছাড়া, আছে শুধু কিছু স্থানীয় লোককথা। তাই অনুবাদে বিদেশি শিশু সাহিত্য ছেপে সেই অভাব মোচন করা হয়। ভারতীয় ভাষার প্রধান লিখিয়েরা মৌলিক শিশু সাহিত্য রচনা করেন না। আলাদা করেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও শিশু সাহিত্যিক নেই, কেননা এদেশের সাহিত্যজগতে শিশু সাহিত্যেরই কোনও গুরুত্ব নেই। ভারতীয় সাহিত্যে ওটা এক এলেবেলে শাখা। ছোটদের জন্যে নেহাৎ যেটুকু লেখা হয় তা রসসাহিত্য নয়, জীবনী, ইতিহাসের কাহিনি, জ্ঞানের কথা, বিজ্ঞানের কথা, বিজ্ঞানের কথা, স্কুলপাঠ্য হিসাবে। অথচ ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি ভাষার সাহিত্যে আমাদের অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। আমাদের শৈশব মৌলিক শিশু সাহিত্যের প্রভায় উজ্জ্বল ছিল।

আমাদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারেরা সকলেই শিশুদের জন্য মনের আনন্দে লিখেছেন। গদ্য, পদ্য এবং নাটক, সর্বক্ষেত্রেই তাঁদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। রূপকথা, রহস্য উপন্যাস, হাসির গল্প, ভূতের গল্প, কিম্ভূত কাহিনি, ঐতিহাসিক কাহিনি, উপকথা, সামাজিক কাহিনি, ভ্রমণের গল্প, বিজ্ঞানের গল্প, অনুবাদে বিদেশি সাহিত্য, কবিতা, ছড়া নাটিকা, জীবনী, স্মৃতিকথা, থরে থরে এনে শিশুদের সামনে সাজিয়ে ধরেছেন আমাদের সাহিত্যিকেরা। ঠাকুরমার ঝুলি থেকে ধরলে একশো বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপায়ে চলেছে বাঙালি শিশুদের এই সুস্বাদু নেমন্তন্ন, ছোটদের জন্যে এই মহাভোজ। ক্রমশ দেখছি সমস্ত প্রধান লেখক তার রাঁধুনি। রেডিওতে ছিল ছোটদের জন্যে নির্দিষ্ট জমজমাট বাংলা সাহিত্যের প্রোগ্রাম, হয়তো আজও আছে। একাধিক জনপ্রিয় বাংলা শিশুপত্রিকা বেরিয়েছে আমাদের ছোটবেলাতে, এখনও তাদের কিছু চালু আছে। রংমশাল, রামধনু, পাঠশালা, মৌচাক, শিশুসাথী-এরা আর নেই, কিন্তু আমার কাছেই তো আসে সন্দেশ, শুকতারা, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, কিশোরভারতী, চিল্ড্রেন্স ডিটেক্টিভ, ঝিলিমিলি, শিশুমেলা, ঝিনুক, শাপলা, রং বেরং, সড়গড়, টুকলু, ঝালাপালা এবং আরও অনেক। এখনও গ্রামে গঞ্জে নতুন নতুন ছোটদের পত্রিকা বেরুচ্ছে। শুধু তো কলকাতাতে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে প্রচুর ছোটদের কাগজ বেরোয়। 'ছোটদের লিটল ম্যাগাজিন' ও বলা যায় কিছু কিছু রোগা পাতলা আদুরে আহ্লাদী কাগজকে! বাংলার বড় লেখকেরা ছোটদের জন্যে তখনও ভালবেসে লিখতেন এখনও লেখেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও বাংলা শিশুসাহিত্যের নক্ষত্র ছিলেন আমাদের বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিকেরা, যাঁরা সারাজীবন ছোটদের জন্যই লিখেছেন। 'সন্দেশ' পত্রিকাতে তো জবরদস্ত একগুচ্ছ বিশুদ্ধ শিশু সাহিত্যিক তৈরি হয়েছেন, যাঁরা শুধুই ছোটদের জন্যে কলম ধরেন। শিশু সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব করা সাজে।

এতকাল বাদে, একুশ শতকের এই বিশ্বায়িত বাঙালি শৈশবের নতুন ঝাঁ চকচকে অঙ্গনে দাঁড়িয়ে শিশুমনের 'উপযুক্ত লেখা' কী হবে, তা নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। সে যে কী বস্তু, সেটা বাছতে বসে কিছু প্রসিদ্ধ ছোটদের পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি নতুন করে নির্ধারিত হচ্ছে। 'অবাস্তব কল্পনা', 'আধুনিক সময়োচিত নয়' বলে রূপকথাকে খারিজ করে দিয়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে 'যুগোপযোগী'

সাহিত্যকে। এখন চাই বাস্তবপন্থী জাগতিক জটিলতার সামাজিক কাহিনি, মনস্তাত্ত্বিক জট, রহস্য রোমাঞ্চ, কৌতুক পেলে ক্ষতি নেই (সেটা কমিক্স-এই হয়ে যাবে) একটু রোমান্সও থাকতে পারে, আর কল্পনাকে হতে হবে কল্পনা চাওলা। শুধু চলবে সায়েন্স ফিকশন। অন্য ধরনের পুরনো ফ্যান্টাসি কালোপযোগী নয়। অথচ চাই বা না চাই আপাতত এদেশেও কিশোর পড়ুয়াদের যুগটা তো বাস্তব-অবাস্তবে মাখামাখি, জাদুর কাঠির আলোআঁধারিতে মন্ত্রমুগ্ধ এক মোহ মেদুর জগৎ, হ্যারি পটারের যুগ। বিদেশি ফ্যান্টাসি এদেশের ছোটদের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে চলেছে, অথচ আমাদের ছোটদের পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে, সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে পটারের বাস্তবের মিল নেই। ওদের দেশের ডাকিনী বিদ্যার সঙ্গে আমাদের কোনও চেনাশুনো নেই, ওরকম কোনও ইশকুল এদেশের কোনও পাড়াতেই নেই (পাহাড়ের ওপরে মহার্ঘ সাহেবি কেতার বোর্ডিং স্কুলের সঙ্গে ক'জন শিশু পরিচিত?) নিজের ইশকুলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পটারের গল্প সবটা মেলানো সম্ভব নয়, তবুও কেন এদেশে তার এত নাবালক ভক্ত পাঠক? কেন না হ্যারি পটারে শুরু হয়েছিল অন্য এক আধুনিক রূপকথা। রূপকথা মানেই তো অচেনা, সে তো প্রাত্যহিকের কথা নয়। নাইবা মিলল বাস্তব, মায়াময় রূপকথা পড়ার আনন্দেই হ্যারি পটার পড়ছে তারা। বাস্তবের মতো দেখতে, কিন্তু আসলে তো বাস্তব নয়, এমন কেন সত্যি হয় না আহা? পটারের রূপকথার বৈশিষ্ট্য, তা সহজেই আজকের শিশুদের মনের কাছে পৌঁছয়।

বাচ্চারা স্বেচ্ছায় বই পড়ছে, ইয়া মোটা বই, তা যে ভাষাতেই হোক, মূল বিষয়টা খুব আহ্লাদের। কিন্তু পটারমেনিয়া আমার ভাল লাগেনি, কেননা আমার কোনও মেনিয়াই স্বাস্থ্যকর লাগে না, মেনিয়ার পরের ধাপ তো অবসেশন। পটারমেনিয়ার অন্য নাম বই-পাগলামি হওয়া সত্ত্বেও, বাঁধনছেঁড়া বলে তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে। জানি, উপকারের দিকটা কম নয়। সন্তানের জন্য গল্পের বই কিনতে রাতভোর লাইন দিয়ে বাঙালি মা-বাবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা, এ কখনও ঘটেনি কোনও লেখকের কপালে। এ তপস্যা কি বিফলে যাবার? অত মোটা বই শেষ অবধি পড়ার ধৈর্য একবার অভ্যেস হয়ে গেলে, বাচ্চাগুলির হয়তো বড়দের বই পড়ারও অমূল্য অভ্যাস তৈরি হয়ে যাবে।

জগৎ জুড়ে পটারমেনিয়া আরেকবার প্রমাণ করেছে ছোটদের কল্পনারাজ্যে ফ্যান্টাসি কোনওদিন অবাঞ্ছিত নয়। চালাতে জানলে চিত্তাকর্ষক কাল্পনিক কাহিনি ছোটদের বাজারে নিশ্চয়ই চলবে। তাহলে আমাদের দিশি রূপকথা কেন অবাস্তব বলে অপাংক্তেয় হবে? তাতেও তো আছে ভাল মন্দের, শুভ অশুভের দ্বন্দ্বের প্রতীকী কাহিনী, রূপকের আড়ালে ভয়াবহ সব বাস্তবের ছবি, মূল্যবোধ তৈরির চেষ্টা। ঠাকুরমার ঝুলির শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে, হাইপ ছাড়াই, সেই পুরনো প্যাকেজিং-এ একশো বছর ধরে প্রকাশকের ঘরে প্রচুর লক্ষ্মী সরবরাহ করছেন ওই ঝুলিটি। এখনও তার বিক্রিবাটা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নবীন লিখিয়েদের চেয়ে বেশি বৈ তো কম নয়!

তা সত্ত্বেও আজকাল বড় ভয়াবহ একটি কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, বাংলাতেও নাকি শিশু সাহিত্যের আকাল পড়েছে। একে তো শিশুরা আগের মতো উৎসাহ নিয়ে বাংলা শিশু সাহিত্য পড়ে না, (তারা বাংলাই পড়ে না, বড় হয়ে বড়দের সাহিত্যও পড়বে না) তার ওপরে সাহিত্যিকরাও ঠিক আজকের শিশুদের উপযুক্ত লেখা লিখছেন না। ওল্ড ফ্যাশনড হয়ে যাচ্ছেন। ফেলুদার এফেক্টে অনেকদিন ধরেই আমাদের লেখকরা সবাই কিশোরদের জন্যে রহস্য রোমাঞ্চ লিখতে ব্যস্ত, যা ছোট বড় উভয়ের মনে ধরবে। কিন্তু সবাই তো ফেলুদাপার্টি নন। ফেলুদার বড়দেরও ছোট বানিয়ে ফেলার ম্যাজিকের বদলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকালকার ফ্যাশন হয়েছে যারা আধা ছোট আধা বড়, তাদের পুরোপুরি বড় করে দেওয়ার মতো 'কিশোর' সাহিত্য সৃষ্টি। 'টিন এজ' এখন সর্বত্র বাজার টানে, কমার্শিয়াল ছোটদের পত্রিকাতেও আজ 'টিন'-ই প্রধান। সেও তো নতুন নয়, আমার বাবা নরেন্দ্র দেব ষাট বছর আগে তাঁর 'পাঠশালা' পত্রিকাতে 'টিন এজ'-এর জন্যে প্রথম কিশোর উপন্যাস লিখেছিলেন,'পরাগ ও রেনু'। (কিন্তু সে কৈশোরের স্বাদ গন্ধ ছিল আলাদা) কিন্তু তার আগের সময়টা? শৈশব? শৈশবের জন্যে কী দেব আমরা?

প্রসঙ্গত বলি, সেদিন এক দারুণ ব্যাপার জেনেছি। আমাদের সময়ের প্রিয় শিশুসাহিত্যিক কবি সুনির্মল বসুকে আজকের শিশুরা প্রধানত পাঠ্যপুস্তকেই চেনে বটে, কিন্তু তাঁর নামে একটি বেশ বড়সড় শিশুদের গ্রন্থাগার আছে ঢাকুরিয়াতে। খুব গর্ব হয়েছিল জেনে, যে একজন শিশু সাহিত্যিকের স্মৃতিতে তাঁর গুণমুগ্ধেরা একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছেন, এবং সেটি এত বছর ধরে চলছে। বাংলা সাহিত্যেই

ফেলুদার বড়দেরও ছোট বানিয়ে ফেলার ম্যাজিকের বদলে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকালকার ফ্যাশন হয়েছে যারা আধা ছোট আধা বড়, তাদের পুরোপুরি বড় করে দেওয়ার মতো 'কিশোর' সাহিত্য সৃষ্টি

এমনটি সম্ভব। শুনলুম সুনির্মল বসুর রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে, এই বইতে থাকছে তাঁর প্রচুর রূপকথার গল্প, এবং আমাদের বাল্যের অন্যতম বেস্ট সেলার, ছোটদের রহস্যোপন্যাস "মরণের ডাক"। এই ধরনের পুনর্মুদ্রণকে স্বাগত জানাই। শুধু ছোটরা কেন, আমার মতো যারা তখন ছোট ছিলেন এখন বড়, এ তো তাদের জন্যেও নতুন করে ভাল লাগার সুযোগ। এই সেদিন আঠারো খণ্ড হেমেন্দ্র কুমার রায় কিনেছি। আমার কাছে কোনও দিন পুরনো হবেন না জয়ন্ত মানিক, বিমল কুমার, বাঘা, হুম হুম করা সুন্দরবাবু, এবং তাঁর ধূমায়িত চায়ের কাপ, ডবল ডিমের অমলেট, আর রামহরির তৈরি জিবে জল আনা চপ কাটলেট!

আমাদের বাল্যকালে শিশু সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। যে কোনও একটি শারদীয়া খুলে লেখকসূচিতে চোখ বোলালেই দেখতে পাই শিশুসাথী ও দেবসাহিত্য কুটিরের দৌলতে আমাদের মাথায় কাদের হাতের কল্যাণস্পর্শ পড়েছে প্রতি বছর। তালিকা দিই? রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, অনুরূপা দেবী, হাসিরাশি দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুখলতা রাও, সুকুমার দে সরকার, জসীমউদ্দীন, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র দেব, রাধারানি দেবী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো) বিমল চন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশা দেবী, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, যাদুসম্রাট পি সি সরকার, রবীন্দ্রলাল মৈত্র, লীলা মজুমদার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, আরও অজস্র প্রাতঃস্মরণীয় নাম। দেব সাহিত্য কুটিরের সঙ্গে শিশুসাথীর চেহারা ও চরিত্রে বিশেষ তফাত ছিল না, অন্তত আমাদের কাছে নয়। আর লেখার সঙ্গে কী সুন্দর সুন্দর ছবি, কারা আঁকছেন? পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, নারায়ণ দেবনাথ, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু খান, ধীরেন বল, সমর দে। এঁদের অধিকাংশই বিশেষ করে ছোটদের মন ভোলানোর জন্যেই ছবি আঁকতেন।

আমাদের সেই পুজোবার্ষিকীগুলোর মতো শক্তপোক্ত, মোটাসোটা, কাপড়ে মোড়া মেরুদণ্ড, ভিতরে বাইরে আদর ভরা ঝলমলে, সে ঝকঝকে আর্ট পেপারে ছাপার গুণেই হোক, কি পাতাজোড়া রঙিন ছবি, এবং ভিতরের অতি মনোরম রেখাচিত্রের আকর্ষণে, কিম্বা নামী লেখকদের সযত্ন রচনার সম্মিলনেই হোক, মোটকথা পুজোর সময়ে চোখ ধাঁধানো যে বইটি (বই দুটি) আমাদের হাতে এসে পৌঁছতো, তাদের তুলনায় কোনও ছোটদের পুজোবার্ষিকী কি আজ বেরুচ্ছে? পুজোর জামা, পুজোর জুতোর সমান সমান লোভ ছিল আমাদের ছোটদের পুজোবার্ষিকীর প্রতি। একটা ব্যক্তিগত সংযোগ সৃষ্টি হত বইগুলোর সঙ্গে, নিজস্ব অধিকারবোধ, মায়া মমতা তৈরি হত। আমার প্রিয় বার্ষিকীগুলি অনেক হারিয়েও কিছু এখনও রয়েছে। এখনও ঝলমলে, এখনও ধরলে ছাড়া কঠিন। নতুন পুজোবার্ষিকীর জন্যে আমাদের সেই অধীর আগ্রহে দিন গুনে গুনে প্রতীক্ষা, আজকের হ্যারি পটারের নতুন বই-এর জন্য ছোটদের আকুল আকাঙ্ক্ষার চেয়ে একটুও কম ছিল না, শুধু এই কাড়াকাড়ির বাড়াবাড়িটা ছিল না। অত ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে আজকের শিশুরা কি তাদের পুজোবার্ষিকীগুলির জন্য প্রতীক্ষা করে? ত্রুটি কার? আজকের বইগুলি কি আর তবে আগের সঙ্গে তুলনীয় নেই ছোটদের চিত্তাকর্ষণের ক্ষমতায়? নাকি ছোটরাই আর ছোট থাকছে না? আমাদের বর্তমান সময়টা বিশেষ টালমাটালের, সময়ের সঙ্গে ছোটদেরও রুচির পরিবর্তন হয়, পত্রিকার অদলবদলও নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু নতুন করে সুরুচি তৈরির দায়িত্বও তো নেবে পত্রিকাই, মূল্যবোধ তৈরির কাজও তার। পুরনো দিনের পত্রিকাগুলি এ দায়িত্ব পালন করত।

এই বছর ঠাকুরমার ঝুলির শতবার্ষিকী. আমাদের উচিত রূপকথার দিকে একটু নজর দেওয়া। বড় সুন্দর সুন্দর রূপকথা আছে বাংলাতে। এখনও আছেন শৈলেন ঘোষ, গৌরী ধর্মপাল, তাঁদের কলমের চাল ছোটদের খুব মনের মতো। রূপকথার মাধ্যমে আমরা শিশুদের সহজে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে শেখাতে পারি। আগের মতো পুরুষতন্ত্রের ধ্বজা ওড়ানো নিষ্ঠুর রূপকথা নয়, সেগুলি তোলা থাক লোককথার অঙ্গ হয়ে, ইতিহাসের পাতাতে। আজকের যুগের নতুন রূপকথা লেখা যায় বৈ কি! এবং লেখা হচ্ছে। ছোটরা শিখুক, শক্তি এখন তরোয়ালের ধারে নয় বুদ্ধির ধারে, আর সাহস সহৃদয়তার জোরে। রাজা মানেই যুদ্ধবাজ নয়, রাক্ষস মানেই মন্দ নয়, রাজকন্যে মানেই অসহায় নয়. এদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হচ্ছে নতুন যুগের রূপকথাতে। নতুন সময়ের জরুরি মূল্যবোধগুলি ছোটদের মনের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ নতুন রূপকথা করতে পারে। ভাল মন্দের ধারণা, জরুরি অজরুরির ধারণা, শক্তিমান ও শক্তিহীনের ধারণা, সবই তো পাল্টে যাচ্ছে। সে সব প্রতিদিনের বাঁচার রসদ কিছুটা তো (যেমন, যুদ্ধের, হিংসার বিরোধিতা, শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ-এর বিরোধিতা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পশু পাখি উদ্ভিদ প্রেম দুর্বলের প্রতি দায়িত্ববোধ ইত্যাদি কিছু মৌলিক জীবনবোধ) জুগিয়ে দিতেই পারে ভাল নতুন রূপকথা। আমি তো বহুকাল ধরে আমার রূপকথাতে নতুন পৃথিবীর নতুন মূল্যবোধগুলির সঙ্গে সন্তর্পণে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার ছোট পড়ুয়াদের। 'ভুলিয়ে শটকে শেখাতে' রূপকথা ওস্তাদ! কী হবে তাকে 'বাতিল' বলে ফেলে দিয়ে, কাজে লাগানো হোক না এত শক্তিশালী একটি মাধ্যমকে? কালকের পৃথিবীর প্রতি খানিকটা দায় তো আছে আমাদের, সেই দায়ের ভাগ নিতে শিখুক শিশুরা। রূপকথার গল্পের সেই সুবিধেটা আছে, গল্প ঠিকঠাক করে বলতে পারলে আসল খবরটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যায়। যেহেতু অনুচ্চারিত থাকে তার ভিতরের লুকনো শিক্ষাটুকু, সেটা শিখে নিতে হয় শিশুকে নিজে নিজেই। সেই শেখাটা ভোলার নয়।

৬.১০.০৭

Login: 3,800 Companies
Password: GNIIT

Change
the way the
world
sees you

NIIT
Be more ambitious

TECHNOLOGY SPECIALIZATIONS • MULTIPLE TRACKS • PLACEMENT PARTNERSHIPS
INDUSTRY ENDORSED GNIIT

Walk-in to your nearest
NIIT Centre TODAY

কেলেঙ্কারির একশেষ

কেলেঙ্কারি কাণ্ড চলছে এলোরায়। লাইট, সাউন্ড, অ্যাকশন, ট্রলি—হইহই রইরই ব্যাপার। রোববার-এর হয়ে একঝলক মেপে এলেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদা আর নারীবর্জিত নয়। যেখানেই আঁখিপাত, সেখানেই যুবতী উন্মীলিত। এবং যত কেলেঙ্কারি সুন্দরী সমারোহের মধ্যেই। তবে যুবতীরা নিরাপদ দূরত্বে পাথরপ্রতিমা, পর্বতাঙ্গে খোদিত বিভঙ্গে নিশ্চল। এবং গুহাশ্রিত শৃঙ্গারমহলে ঘটছে আন্তর্জাতিক অপরাধ। লাশপতন অকস্মাৎ। অপরাধ ও রহস্যের সূত্র ধরে সেখানে ফেলুদা, ওরফে বাঙালির প্রিয় গোয়েন্দা ফেলু মিত্তির ওরফে প্রদোষ মিত্র; তার তরুণ সহকারী খুড়তুতো ভাই তোপ্‌সে (তপেশ); আর অপরিহার্য লালমোহন গাঙ্গুলি যিনি 'জটায়ু' ছদ্মনামে লেখেন 'মেরুমহাতঙ্ক', 'গোরিলার গোগ্রাস', 'হিমালয়ে হৃৎকম্প', 'আণবিক দানব'-এর মতো রহস্য-উপন্যাস আর যিনি 'টেলিপ্যাথিক'-কে বলেন 'টেলিপ্যাথেটিক', 'ফ্রিজিডেয়ার'-কে 'ফ্রিডিজেয়ার' এবং যিনি সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সেজে 'রাষ্ট্রকূট' রাজবংশের উল্লেখ করতে গিয়ে মুখ ফসকে বলে বসেন 'রাষ্ট্রপুট'।

ফেলু মিত্তির এবার কৈলাসে। 'কৈলাস'-এ যেতে

হবে শুনে অনন্য লালমোহনবাবু ফেলুদাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কৈলাস! সে কী মশাই, আপনার কি তিব্বতে কেস পড়ল না কি? সেখানে তো শুনিচি চিনেদের রাজত্ব।' আমি হঠাৎ কৈলাসে যাচ্ছি শুনেও কেউ কেউ ভেবেছেন, অবশেষে মতিগতি ফিরেছে আমার, আমি তীর্থে যাচ্ছি। ফেলুদার পাঁচটি অব্যর্থ শব্দে আমারও উত্তর, 'কৈলাস পাহাড় নয়। কৈলাস মন্দির।'

কলকাতা থেকে উড়ানে মুম্বই। মুম্বই থেকে ফের উড়ানে আওরঙ্গাবাদ। সেখান থেকে দৌলতাবাদ দুর্গের পাশ দিয়ে আঠাশ কিলোমিটারের সান্ধ্যসরণি গাড়িতে পেরিয়ে (যে পথ ১৯৪০-এ পেরিয়ে ছিলেন সত্যজিৎ রায় গরুর গাড়িতে) শেষ পর্যন্ত কৈলাসে। মন্দিরে নয়। 'কৈলাস' রিসর্টে। এলোরার সারিবদ্ধ গুহার ঠিক উল্টোদিকে। আমার মতো মৃদু মার্জারের ভাগ্যেও খসেছে সৌভাগ্যশিকে—স্বয়ং ফেলুদা (সব্যসাচী চক্রবর্তী), লালমোহন গাঙ্গুলি (বিভু ভট্টাচার্য), তোপসের (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে ছুটি কাটাবার। কাল সকালেই যাব এই অনবদ্য ত্রয়ীর সঙ্গে 'রিসর্ট' কৈলাস থেকে 'আসল' কৈলাসে, যেখানে কেলেঙ্কারির রহস্য ক্রমশই জটিল হচ্ছে। আপাতত যেই নেমেছি রিসর্টের সামনে গাড়ি থেকে অমনি ডাক, 'এই যে, এদিকে!' এ-কণ্ঠ বঙ্গবিখ্যাত। তাকিয়ে দেখি রিসর্টের ফটকের পাশে রাস্তার ওপরে এক জমজমাট চায়ের দোকানে আমাদের প্রিয় অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। টেবিলের উল্টোদিকে ঠোঁটে ওয়েলকাম হাসির সঙ্গে ঈষৎ দুষ্টু ইশারার ককটেল বানিয়ে বন্ধুবর সত্যম রায়চৌধুরী। ইনিই সেই সত্যম যিনি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কর্ণধার। তবে এখানে এসেছেন কৈলাসে কেলেঙ্কারি ছবির প্রযোজক মৌ (মৌসুমী) রায়চৌধুরীর নেমন্তন্নে (মৌ সম্পর্কে সত্যমের ধর্মপত্নী)। সত্যম এসেছেন আমারই মতো ছুটি কাটাতে। দেখেই বুঝলাম, এসেই জড়িয়ে গিয়েছেন রহস্যের সঙ্গে, কলকাতার কাজফাজ ভুলে। 'এখন রাত প্রায় আটটা। চা খাবে!' বিপ্লবের মহৎ বিস্ময়। মহত্তর ইঙ্গিত সত্যমের হাসিতে। তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। গুটিগুটি এগোলাম আমরা রিসর্টের রেস্তোরাঁর দিকে। সেখানে চলতি কোনও মধুশালা নেই বটে। কিন্তু চলতি অভাবও নেই। থরে-থরেই সাজানো ব্যাপার। উৎসাহের থই-থই। রেস্তোরাঁয় ঢুকেই আরও বাড়ল তৃষ্ণা।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-কাহিনির 'তৎসম'-কে কিঞ্চিৎ ভেঙেচুরে 'তদ্ভব' ছবি করছেন সন্দীপ রায়। কৈলাসে কেলেঙ্কারি লেখা হয়েছিল তিয়াত্তর সালে। প্রথম নাম ছিল কৈলাস রহস্য। তারপর সম্ভবত লালমোহনবাবুর প্রভাবে নাম হল কৈলাসে কেলেঙ্কারি। ১৯৭৩ থেকে ২০০৭ চৌতিরিশ বছরের ফারাক 'সেটা ছিল টেলিগ্রাম আর টেলিফোনের যুগ। বাবার গল্পের মধ্যে টেলিগ্রাম, টেলিফোনের ব্যাপারটা আছে এখন হল সেল ফোন-এসএমএস-ই মেল-ল্যাপটপ-ডিজিটাল ক্যামেরার যুগ। এই পরিবর্তনের ফলে সাংঘাতিক গতি এসেছে জীবনে। এবং ফেলুদাকেও একালের উপযোগী হতে হচ্ছে। ফলে বাবার গল্পে কিছু পরিবর্তন তো আনতেই হয়েছে', বললেন সন্দীপ রায়। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল এলোরার ষোলো নম্বর গুহা 'কৈলাস'-এর সামনে বসে, ডাল-রুটি-মাছ-ভাতের মিশ্র লাঞ্চ সারতে সারতে। কৈলাসে দিব্য মাছ-ভাত এবং সঙ্গে ফেলুদা-তোপসে-জটায়ু! এতো ২০০৭-এ এলোরার নবজন্ম

শ্যুটিং-এর প্রথম দিন থেকেই এলোরায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। তিনি জয়ন্ত মল্লিকের ভূমিকায় যাঁরা 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' পড়েছেন তাঁরা জানেন গল্পের প্রথম থেকেই এই ব্যক্তিটিকে সারাক্ষণ অপরাধী বলে সন্দেহ হয়। ফেলুদাও প্রাথমিকভাবে সেই ভুলটাই করে।

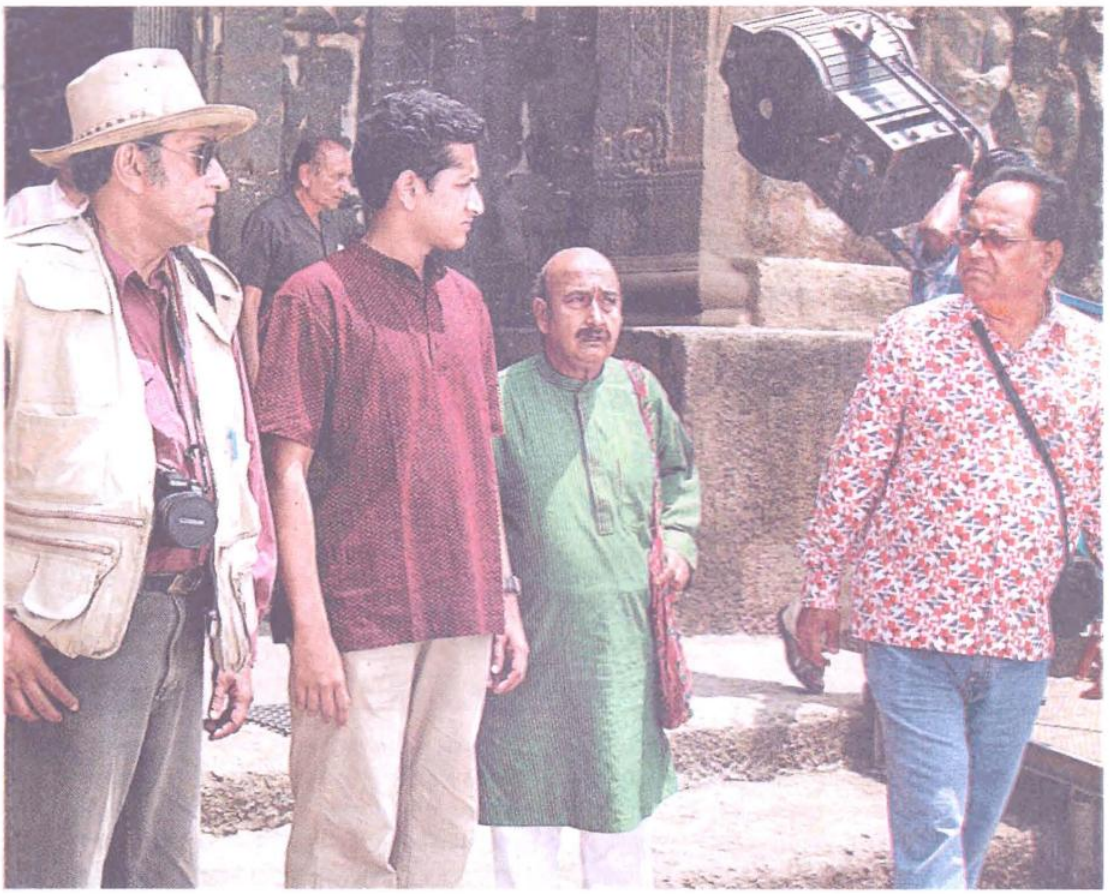

ফলে রহস্য আরও জটিল হয়। তাই জয়ন্ত মল্লিকের চরিত্রে বিপ্লব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। 'সত্যজিৎ রায়ের গল্পে সিনেমার প্রয়োজনে হয়তো সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে সন্দীপ, কিন্তু পুরোপুরি সত্যজিৎ-ঘরানার পরিচালক, যেভাবে চিত্রনাট্য লিখেছে, শ্যুটিং স্ক্রিপ্টের প্রতিটি দৃশ্য আলাদা-আলাদাভাবে এঁকে এঁকে ভেবেছে, তাছাড়া শ্যুটিংয়ের সময়েই এডিটিংয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথায় রাখছে—এ রকম চিত্রনাট্যে বহুদিন কাজ করিনি। কৈলাসে কেলেঙ্কারি মুক্তি পাবে ক্রিসমাসের সময়ে। ছেলেমেয়েদের ছুটি তখন। দলে দলে বাঙালি দেখবে। বলে দিচ্ছি, 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' সুপারহিট হয়ে যাবে', বললেন বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়। 'আমি এ-ছবির অবজার্ভার', হাসতে হাসতে বললেন আপাতত নেপথ্যবিলাসী, সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। ঝেড়ে-না-কেশে এইটুকু বক্তব্য তাঁর, 'কৈলাসে কেলেঙ্কারির বাণিজ্যিক সাফল্য অনিবার্য। আমি চিত্রনাট্যটা আগাগোড়া পড়েছি। দ্রুত অ্যাকশন। একটার পর একটা ঘটনা। অপ্রত্যাশিত নাটকীয় মুহূর্ত। গল্পের অসম্ভব টান। তাছাড়া মনে রাখতে হবে সন্দীপ রায়ের ছবি। তবে ছবিটার মার্কেটিং-এর জন্য যা করার করব। যেমন এনআরআই বাঙালিদের কাছে যাতে ছবিটা পৌঁছয় সেই ব্যবস্থা করব। রিলিজের আগে প্রেসমিট করব, কার্টেন রেজার যাকে বলে। এ-ছাড়া ফেলুদা-জটায়ু-তোপ্‌সেকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সিটি ও টাউনগুলোতে ঘুরব ছবিটার প্রচার করতে। ছবিটার আন্তর্জাতিক প্রচারের ব্যাপারটাও আমি দেখব।' ফিফটি-ফিফটি যৌথ-প্রযোজনায় তৈরি হচ্ছে কৈলাসে কেলেঙ্কারি। একদিকে টি সরকার ফিল্মস-এর সুমিতা ভট্টাচার্য। অন্যদিকে ইনোভেটিভ মাল্টিমিডিয়া-র মৌ রায়চৌধুরী ও ইন্দ্রনীল সেন, যিনি আপাতত নিজেকে অবজার্ভার ভাবতেই ভালবাসছেন। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটের সুপার সাফল্যের পর আরও একটা ফেলুদার ছবির জন্য দর্শক উদগ্রীব হয়ে আছে। ফলে কৈলাসে কেলেঙ্কারির বাণিজ্যিক সাফল্যের ব্যাপারে আমি সাংঘাতিক আশাবাদী। আমরা অনেক ছবির প্রযোজনা করেছি। কিন্তু বাবুদার (সন্দীপ রায়) সঙ্গে কাজ করলাম এই প্রথম। ওঁর কাজ করার ধরণটা একেবারে অন্যরকম। শিডিউল মতো ঠিকঠিক চলেন। সময় নষ্ট করেন না। সব একেবারে নিয়মে বাঁধা। বাজেটের দিকে সব সময়ে নজর রাখেন, যাতে এতটুকু বাজে খরচ বা বেশি খরচ না হয়ে যায়, অথচ কোয়ালিটির ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ নেই। এ ছাড়া কৈলাসে কেলেঙ্কারি আমার প্রিয় গল্প। সেদিক থেকেও খুব খুশি আমি", বললেন প্রযোজক-সংস্থা টি-সরকার ফিল্মস-এর কর্ণধার সুমিতা ভট্টাচার্য।

যেখানে এত আশাবাদ, এমত খুশি খুশি ভাব, আনন্দের পরিবেশ, সেখানে সকাল থেকেই আলোকচিত্রী হীরক সেনের মুখে নিম্নচাপের মেঘলামি। তার ক্যামেরা আছে। লেন্স নেই। প্রত্যেককেই সন্দেহ করছে। এমনকী ফেলুদাকেও। এত আরও এক কেলেঙ্কারি, বললাম মৌকে। মৌ মুচকি হেসে সন্দীপ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব সময়ে ছোটখাটো মজা করে যাচ্ছেন বাবুদা। এত বড় একটা কাজ হচ্ছে, কিন্তু কোনও টেনশন নেই, যেন একটা পারিবারিক পিকনিক, সবাই মিলে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, গল্প, তারই মধ্যে একটু-আধটু পেছনে লাগা, কারও বা লেন্স হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ঠিক সময়ে পাওয়াও যাবে, খুব ভাল লাগছে। এই ভাললাগার শুরু হয়েছিল বাবুদা যেদিন স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনালেন, সেই

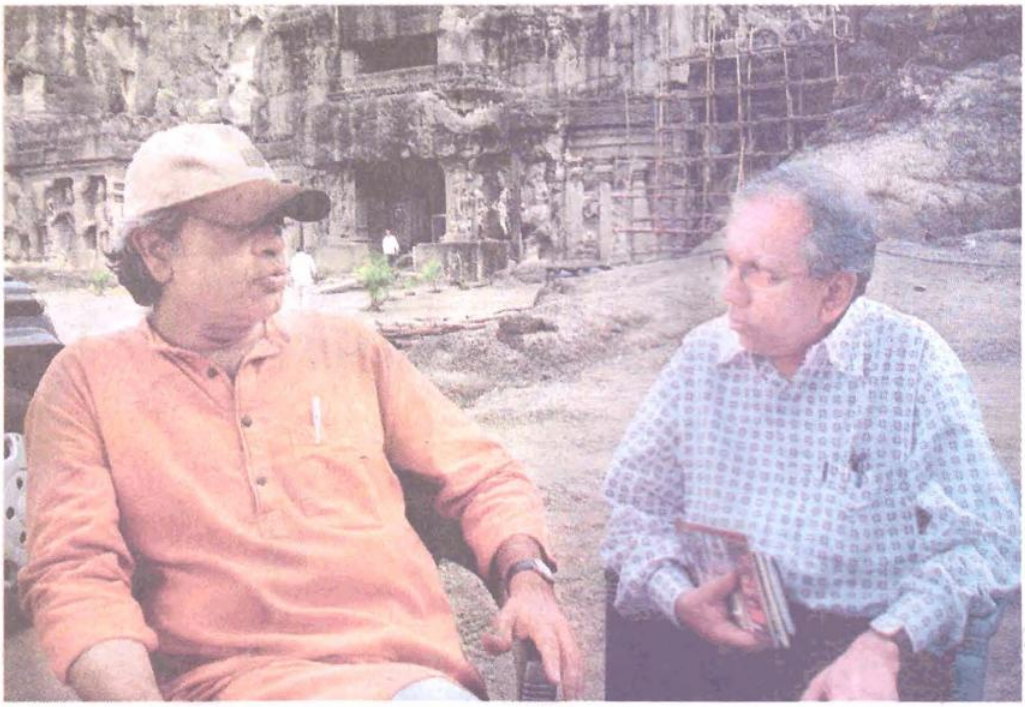

দিন। আমরা সবাই গিয়েছিলাম ওঁর বাড়িতে। ফেলুদা, লালমোহনবাবু তোপ্‌সে, রক্ষিত (দীপঙ্কর দে), জয়ন্ত মল্লিক, সবাই আছে। আর বাবুদা পড়ছেন। ওঁর পড়া শুনতে শুনতে ছবিটাই যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। উনি যে একজন বড় অভিনেতা, সেটা বুঝেছিলাম স্ক্রিপ্ট পড়া থেকেই।' কৈলাসে কেলেঙ্কারির এক ভয়ঙ্কর চরিত্রে দীপঙ্কর দে। তিনি কখনও চট্টরাজ। কখনও রক্ষিত। পদবিতে সাবলীল উভচর। তার বেশি বলা উচিত নয়। দীপঙ্করকে এলোরায় পাইনি, কারণ আমার পৌঁছনোর আগেই তিনি 'শুট' শেষ করে ফিরে গেছেন। নিজের মধ্যে কিংবা রহস্যের মধ্যে সারাক্ষণ ডুবে রয়েছেন ফেলুদা (সব্যসাচী)। সবাইকে দেখছেন সন্দেহের চোখে যেন। শুধু বললেন, 'ইটস আ গ্রেট এক্সপেরিয়েন্স, স্যর, ভুলতে পারব না কোনওদিন।' আর তোপ্‌সে (পরমব্রত) তো নিজেই লিখছে তার কৈলাসের ডায়েরি। জবাব নেই লালমোহনবাবুর। শিশুর সারল্য ও নবজাগরণের বিস্ময় বিভু ভট্টাচার্যের চোখেমুখে সারাক্ষণ। আমাদের পাড়ার ভদ্রলোক অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যও এ ছবিতে খুব বড় চরিত্রে। অধ্যাপক শুভঙ্কর ভট্টাচার্যের ভূমিকায় তাঁরই লাশ পড়ছে কৈলাসে এবং সেই খুনের সূত্র ধরে এগোচ্ছে ফেলুদা। ক্ল্যাপস্টিক দেওয়াও যে এক বিশুদ্ধ আনন্দের ক্রিয়েটিভ কাজ সেটা বারবার বোঝা গেল সন্দীপ-ললিতা-পুত্র সৌরদীপকে দেখে। কৈলাসে কেলেঙ্কারি পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য ঋষি রায়চৌধুরি নাকের ডগায় কালো ফ্রেমের চশমা ঝুলিয়ে সারাক্ষণ নিজের মতো প্যারালাল গোয়েন্দাগিরি চালাল গুহা থেকে গুহায়। এই আছে এই নেই সে চোখের সামনে। বালকের গতিবিধি আর এক টেনশন। সন্দীপ রায় সঙ্গে পেয়েছেন সত্যজিৎ রায়ের আমলের প্রবীণ সহকারী সুব্রত লাহিড়ি ও পুনু সেনকে; সঙ্গে দুই তরুণতুর্কী, জয়দীপ আর সাগ্নিক, আছেন মানিক ভট্টাচার্যের মতো শিল্প-পরিচালক, যিনি এক অপূর্ব 'নকল' তৈরি করেছেন ভুবনেশ্বরে রাজারানি মন্দিরের যক্ষীর মাথার! এবং বানিয়েছেন ছবিতে একটি প্লেন-ক্র্যাশের দৃশ্য! এত বড় একটা দল ও ছবির পরিচালক সন্দীপ রায়ের মুখেচোখে কোনও উদ্বেগ নেই। যখন বোম্বাইয়ের বোম্বেটে করেছিলাম, তখন সবাই তুলনা করেছিল বাবার তৈরি ফেলুদার ছবির সঙ্গে। এবার তুলনাটা হবে আমারই তৈরি বোম্বাইয়ের বোম্বেটে-এর সঙ্গে। প্রতিযোগিতাটা নিজের সঙ্গে। সেটা খেয়াল রেখেছি। খুব অ্যাকশন আছে ছবিটায়। অসম্ভব গতি। গল্পটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না কোথাও, সারাক্ষণ টেনশন থাকছে। ছোটখাটো মজাও আছে। এইটুকু বলতে পারি, সবাই ভাল অভিনয় করছেন, এ-জিনিস চরিত্রের সঙ্গে টোটাল ইনভলমেন্ট ছাড়া সহজ নয়', একটা লম্বা ট্রলি-শট শুরু করার আগে কৈলাস মন্দিরের সামনে বসে বললেন সন্দীপ। কৈলাসে কেলেঙ্কারি থেকে ছবি করার কথা কেন ভাবলেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে সন্দীপ, 'মৌ-ই প্রথম গল্পটা থেকে ছবি করার কথা আমাকে বলে।' হঠাৎ লক্ষ করলাম, সত্যম রায়চৌধুরী লম্বা ট্রলি শট-এর ছবি তুলছেন ক্রমাগত। বললেন, 'এই প্রথম এলোরার গুহায় কোনও বাংলা ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। কোনও ভারতীয় ছবিতেও আমি এলোরাকে কখনও পাইনি। ঐতিহাসিক ঘটনা। তা-ই ছবি তুলে রাখছি।' কৈলাসে কেলেঙ্কারি-তে বিপ্লব বা দীপঙ্কর, পরমব্রত-সব্যসাচী-বিভু, কখন কী পরবেন, কোন মেজাজে কেমন পরিবেশে কী পোশাক বা পোশাকের রং, তার সার্বিক পরিকল্পনায় সন্দীপ রায়ের স্ত্রী ললিতা।' কিন্তু তার থেকেও বড় ভূমিকায় ললিতা রায়। কৈলাসে কেলেঙ্কারি-পরিবারের সার্বিক দেখভাল ও গৃহিণীপনায়। কে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, কে চা-চা করছেন মনে-মনে, কে রোদ্দুরে কষ্ট পাচ্ছেন, কার খিদে পেয়েছে, সব দিকে ছড়িয়ে আছে তাঁর হৃদয়। কলকাতায় চলে আসার দিন ভোরবেলা আমার ঘরের দরজায় মৃদু টোকা। খুলে দেখি কৃষ্ণ চা হাতে তিনি! বহুদিন একলা জীবনে ঠিক এরকম যত্ন পাই না বলেই হয়তো ভেতরটা আমার নত হল কৃতজ্ঞতায়। মনে হল, এখনও জগতে এত মায়া!

ছবি হীরক সেন
সত্যম রায়চৌধুরি

পুজোয় সেরা সাগরিকা

১৪১৪

SAGARIKA

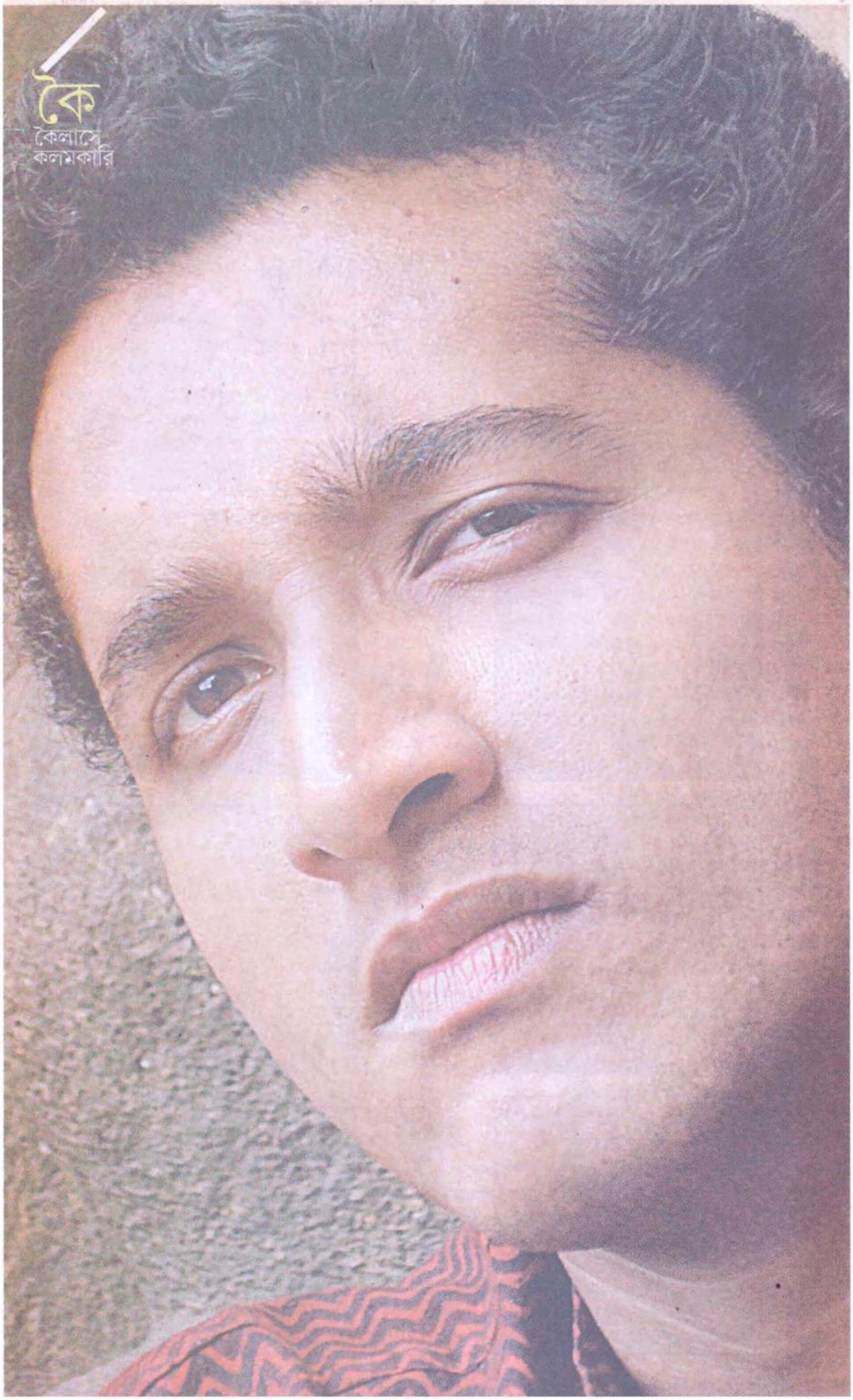

তোপসের ডায়রি

ফেলুদার কৈলাস অভিযান নিয়ে কলম ধরলেন তোপসে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

আমি নিশ্চিত অমলের সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। আজ থেকে পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বছর পর। আমি কিন্তু ডাকঘরের অমলের কথা বলছি না। তার সঙ্গে তো পারলে রোজই দেখা করি। আমি বলছি অমল কক্করের কথা। আমরা, অর্থাৎ সন্দীপ রায়ে'র পরিচালনায় 'কৈলাসে কেলেঙ্কারির' পুরো ইউনিট যেখানে গত পনেরো দিন ধরে আছি এবং পুরোদমে শ্যুটিং করছি, সেই খুলতাবাদ বা এলোরা থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে জালমা নামে একটি ছোট্ট মফস্বল শহর আছে। সেখান থেকে আরও বেশ কিছু মাইল ভিতরে একটি ছোট্ট গ্রামে (নাম ভুলে গিয়েছি! তোপসেকে যা কখনওই মানায় না) অমলের বাড়ি। স্থানীয় সংবাদপত্রে আমাদের শ্যুটিং-এর খবর পড়ে সে কৈলাস মন্দিরের ছাদে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখতে এসেছিল। হাতের কাছে, খবরের কাগজে বেরনো সিনেমা সংক্রান্ত সবরকম খবর সে গোগ্রাসে গিলে ফেলে, তা সে দিশি হোক বা বিদেশি। হঠাৎ করে তার মুখে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, ঋতুপর্ণ ঘোষ, সন্দীপ রায়-এর নাম শুনে তার সঙ্গে আলাপ জমাই। মহারাষ্ট্রের একটি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর গ্রামে থেকে এই নেহাতই 'সাধারণ' ছেলেটি স্বপ্ন দেখে চিত্র পরিচালক হওয়ার, সিনেমা বানানোর। আমাদের দেশের ডাক ব্যবস্থার গাফিলতিতে তার পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার তারিখের একদিন পর এসে পৌঁছয়। অমল কিন্তু দমেনি। আপাতত—আইন পড়া শুরু করলেও আগামী বছর সে আবার বসবে পরীক্ষায়। আমার কাছে তার সহজ অথচ কঠিন প্রশ্ন 'আমি একদম গ্রামের ছেলে তো, জানি অসুবিধে হবে। জানাশোনা কম, কিন্তু যদি ইচ্ছেটা সৎ হয়, তাহলে শেষ অবধি পারব না?

জানি, বাজারচলতি কোনও বাংলা টিয়ারজার্কার-এর গল্পের মতো শোনাচ্ছে ঘটনাটা। পৃথিবীতে বেশিরভাগ ক্লিশে-ই বোধহয় আসলে ভালো। উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করে ভালো লাগবে, না খারাপ লাগবে। আর এই ধরনের ঘটনা শুধু বিস্মিতই করে না; আমরা, যারা এই পোড়া দেশে সিনেমার জগতে করেকম্মে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি, তাদের মধ্যে আবার নতুন কিছু করার ইচ্ছেটাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

অবশ্য আমাদের এবারকার এই ফেলুদা অ্যাডভেঞ্চারে বিস্মিত হওয়ার মতো আরও অনেক উপাদান মজুত। এর মধ্যে কিছু, আগেও ছিল, এখনও আছে, এবং আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে। অন্যগুলো নতুন মুগ্ধতা, নতুন উপলব্ধি। নতুনগুলোর কথাই আগে বলি। আমরা যে কটেজগুলোতে আছি, সেখান থেকে জানলা দিয়ে বাঁদিকে তাকালেই যে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়, তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তৈরি এলোরার চৌত্রিশটি গুহা, যেখানে আমরা প্রায় রোজই সদলবলে যাই শ্যুট করতে। প্রথমদিন যখন গিয়ে ঢুকেছিলাম কৈলাস মন্দির (১৬ নম্বর গুহা) বা দশাবতার (১৫ নম্বর) গুহাতে, তখনও খুব বেশি লোকজন ঢুকে পড়েনি সেখানে। আধো অন্ধকার, ঠাণ্ডা, চামচিকের গন্ধে ভরা গুহাগুলোর কোণগুলো ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল কেউ বা কারা যেন আড়াল থেকে দেখছে আমায়, লক্ষ রাখছে। যেন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমাদের দেশটার বিচিত্র এবং রঙিন ইতিহাসের গন্ধমাখা এই অনন্য অতুলনীয় শিল্পকীর্তির এত কাছাকাছি আসার যোগ্যতা আমার আছে কি না! পরমুহূর্তেই মনে হল, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে, হাজার হাজার দাক্ষিণাত্যের কারিগর, শুধুমাত্র প্রদীপের আলোয়, এবং শুধুই ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে, রাতের পর রাত জেগে, নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন একেকটি গোটা পাহাড় কেটে, সেখান থেকে বিভিন্ন মন্দির, দেওয়ালের কারুকাজ তৈরি করে, রাষ্ট্রকূট (নাকি পল্লব?) বংশের রাজাদের অনন্য কীর্তি স্থাপন করতে। একটি বিশেষ গুহায় ঢুকে দেখতে পেলাম, হাজার হাজার লোকের পাত পড়েছে সারি দিয়ে। গোটা ভোজনকক্ষ সরগরম হয়ে উঠেছে, সারাদিনের কাজ শেষে, তাদের পারস্পরিক সুখ দুঃখের গল্প বিনিময়ে। দশ নম্বর গুহায় ঢুকে মনে হল গৌতম বুদ্ধে'র আসলে খুব মনখারাপ হয়েছিল। মনখারাপ না হলে অবশ্য নির্বাণপ্রাপ্তি হয়ও না বোধহয়। এই গুহাতে, বুদ্ধমূর্তির বিষাদমাখানো মুখ অন্তত যেন তাই বলতে চেষ্টা করে। অনেক মনখারাপ আর অনেক গল্প জমে আছে দোতলা তিনতলার বারান্দা সংলগ্ন ছোট্ট ঘরগুলিতেও। বিদেশ হলে হয়তো কবেই এই নিয়ে ইতিহাস এবং রূপকথা মিশিয়ে একটি বিরাট আকারের ব্লকবাস্টার তৈরি হয়ে যেত...

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা আসলে বড্ড ইতিহাসবিস্মৃত। তা না হলে, এইরকম একটি জাতীয় সম্পদের মধ্যে (যা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হলে অবাক হওয়ার কিন্তু থাকবে না) যত্রতত্র চায়ের কাপ, সিগারেটের শেষাংশ, প্লাস্টিক, পানের পিক, এমনকি কোনও কোনও জায়গায় দেহনিঃসৃত তরল পদার্থ ফেলে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। জানি না, একদিকে যখন এলোরা দেখে ভারতবাসী হিসেবে সত্যিই গর্ব অনুভব করি, তখনই আবার অন্যদিকে কিছু তথাকথিত ভদ্র লোকজনের কারবার দেখে...বাকিটা আর নাই বা বললাম!

বিস্মিত করল আমাদের ট্রলি সেটিং বাবাজিদা-ও, একদিন শ্যুটিং-এ দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পরে আলোচনা হচ্ছিল অজন্তা-এলোরার সঠিক সময়কাল নিয়ে। মাঝপথে বাবাজিদার আকস্মিক প্রশ্ন বেণুকাকুকে (সব্যসাচী চক্রবর্তী)—'আচ্ছা বেণুদা, যারা এইগুলো

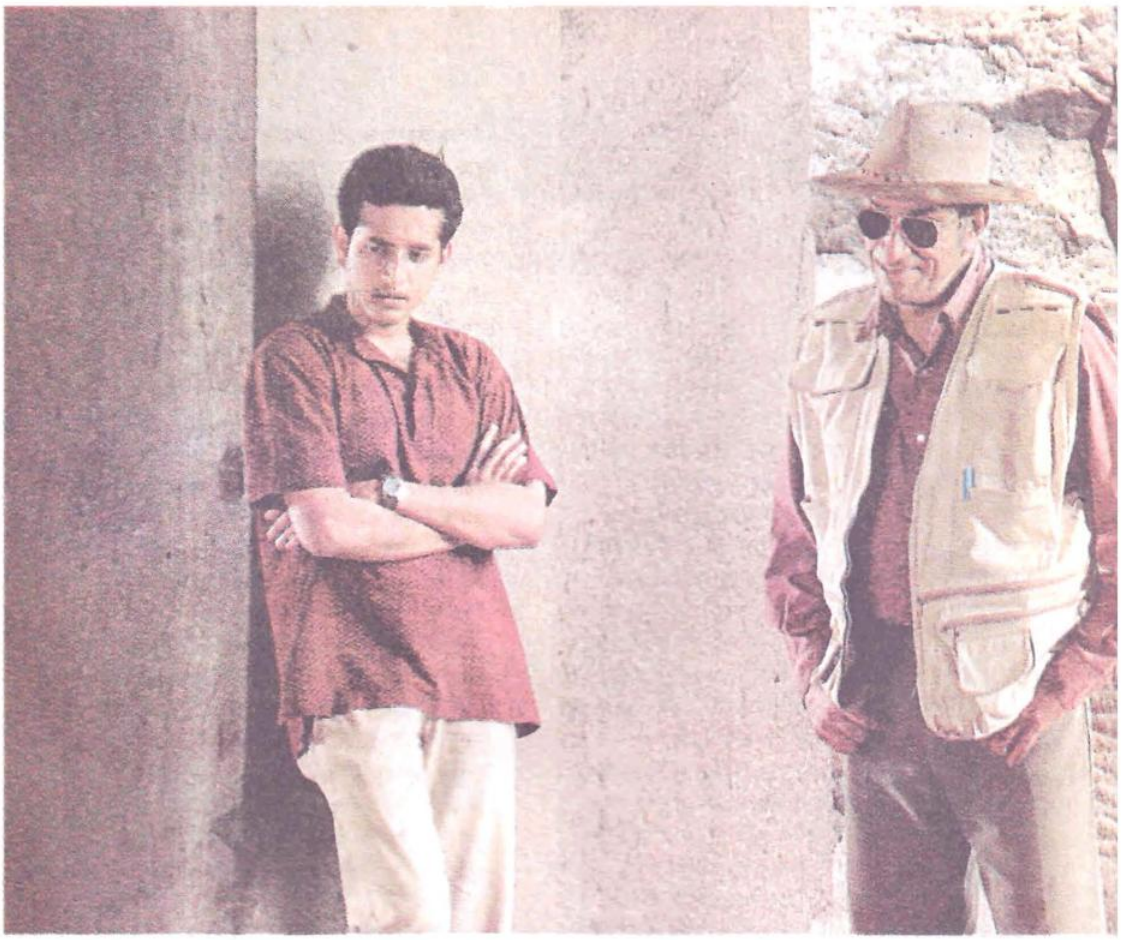

বানিয়েছিল, তারা কত মজুরি পেত?' আলোচনা করতে করতে রোম্যান্টিসিজম-এর চরমে পৌঁছে যাওয়া আমরা অপ্রস্তুতে পড়ি এই প্রশ্নে। হেসে হালকা করার চেষ্টা করি। পরে ভেবে মনে হয়েছে, বাবাজিদা তার নিজস্ব বাস্তবতার জায়গা থেকে সবচাইতে সমীচীন প্রশ্নটাই করেছিল, আর আমাদেরকেও সেটা একটানে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনে দিল। যে বাস্তবটাকে, আমরা 'ভদ্রলোকরা', আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সেটা থাকা সত্ত্বেও, ভুলে থাকার বা আড়াল করার চেষ্টা করি। রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল কারিগরের গুহামন্দির তৈরি করা এবং বিনিময়ে নিখরচায় সংসারসুদ্ধু থাকা খাওয়া, বাবাজিদার জ্ঞানের পরিধির হয়তো বাইরে। তার বাড়ি উড়িষ্যার ভদ্রকে। বিরাট সংসার, চালাতে হয়। সে শুধু জানে কাজ করা মানে (সে যে কাজই হোক) মজুরি পাওয়া, যাতে তার ছেলেমেয়ে বউ দুধে ভাতে না থাকলেও যেন ডালে ভাতে থাকতে পারে। শিল্পের তোয়াক্কা বাবাজিদা খুব একটা করে না। অথচ কী আশ্চর্য, বাবাজিদা যদি একটি বিশেষ দৃশ্যের, যা বিশেষ শটের নিজস্ব ছন্দ, বা গতি না বোঝে, তা হলে তার ঠেলা ট্রলির সঙ্গে তা বেমানান হবে। এবং পর্দায় যে ঘটনাটি ঘটাতে চাওয়া হচ্ছে, তা কখনওই সম্পূর্ণভাবে সফল হবে না। বাবাজি গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমাদের বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, ভুল তার বিশেষ একটা হয় না।

আমাদের পৃথিবীটার অবস্থা এখন বড়ই টালমাটাল। আমরা সকলেই জানি, ধর্মীয় বিভেদ, হানাহানি, তার একটা প্রধান কারণ। প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, তা সে জাতীয় স্তরেই হোক, বা আন্তর্জাতিক স্তরে, নেওয়ার সময়ে কোথাও না কোথাও ধর্মীয় অনুষঙ্গ চলেই আসে একদিকে যেমন রাহুল ঢোলাকিয়া পরিচালিত ছবি 'পরজানিয়া'তে গুজরাট দাঙ্গার জন্যে হিন্দুদেরই প্রধানত দায়ী করা হয়েছে বলে আমাদের দেশের সেন্সর বোর্ড থেকে শুরু করে অনেক তাবড় তাবড় নেতারা বেঁকে বসেন, তেমনই তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে কলকাতা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলিম কট্টরপন্থীরা ফতোয়া জারি করলেও এই শহরের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা মোটামুটি চুপচাপই থাকেন। কিন্তু যাদের আবেগে আঘাত লাগছে ভেবে আমরা এই সাতসতেরো সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকি, সেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষজন বোধহয় অনেক ক্ষেত্রেই এই মুষ্টিমেয় সিদ্ধান্তকারী গোষ্ঠীর বড় একটা তোয়াক্কা করে না। কৈলাস মন্দিরের গায়ের বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির গায়ে নির্লিপ্তভাবে হাত বোলাতে থাকা কিশোর রেহান এবং তার মা নাসিমকে দেখে অন্তত তাই মনে হল।

এলোরা এবং এলোরা সংলগ্ন খুলতাবাদ। দৌলতাবাদ এবং অওরঙ্গবাদ, বলাই বাহুল্য, মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এলোরার প্রাত্যহিক দর্শনার্থীদের মধ্যে, লক্ষ করলে সহজেই চোখে পড়ে, অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ মুসলমান। এমনকি কৈলাস মন্দিরের বাইরে গণেশ মূর্তি বা শিবলিঙ্গ বিক্রেতারা প্রায় সবাই মুসলমান। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা বিষ্ণুর অবতারগুলোর নামও আমাদের ড্রাইভার নাজিরের প্রায় মুখস্থ! আমি নিজে ওই

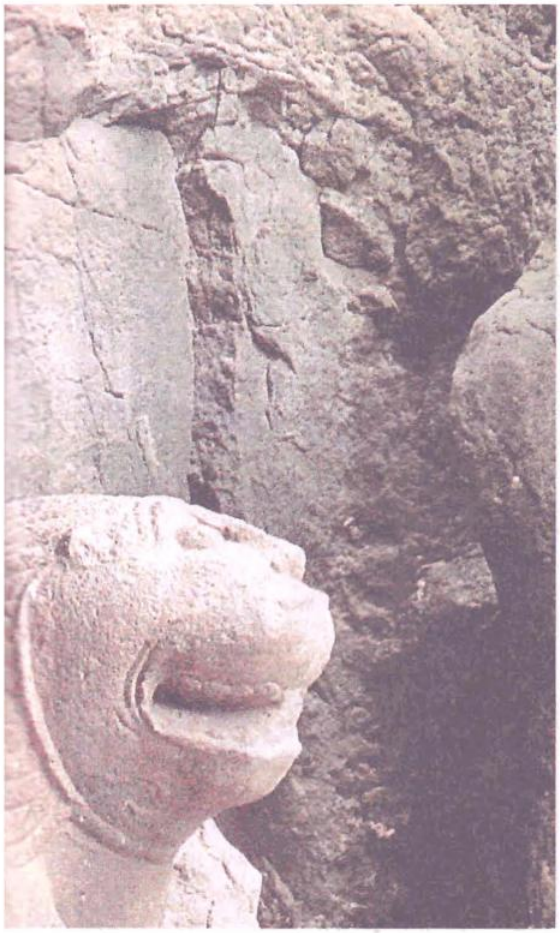

সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং বিভিন্ন তকমা লাগিয়ে দেওয়ার দলের মধ্যে পড়ি বলেই এত অবাক হচ্ছি। আমরাই নিজেদের মতো করে বিভেদ তৈরি করি, ভয় পাই, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে কষ্টকল্পনা করে গরুর রচনা লিখি, কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত এই বাস্তবতার মধ্যে বাঁচছে, তাদের কাছে গোটা ব্যাপারটা এত আলোচনা করার মতো বিষয়ই নয় বলে মনে হল আমার। তারা তো একসঙ্গে পাশাপাশি থাকে, ব্যবসা করে একে অন্যের সঙ্গে। বন্ধুত্ব করে। মাঝে মধ্যে রেগে গিয়ে ঝগড়া করে। আবার ভাব করে নেয়...একটা পাড়ায় ৪এ আর ৪বি বাড়ির প্রতিবেশী বাসিন্দাদের মতো। এই নিয়ে এত লেখালেখি করারই বা আছে কী? ভিন্ন ধর্মের ভগবানের মূর্তির গায়ে রেহানের নির্লিপ্ত আঙুলগুলো বোধহয় এই কথাটারই সিম্বল। খুব ইচ্ছে ছিল পার্বতীর এক অসামান্য মূর্তির সামনে অসামান্য সুন্দরী নাসিমের একটা ছবি তুলব। ক্যামেরা বের করে ফ্রেম করতে করতে দেখি সে ততক্ষণে রওনা দিয়েছে পরবর্তী গুহার উদ্দেশে। আমারও ডাক পড়ে গেল মাঠে যাওয়ার। সত্যিই কী বিচিত্র আমাদের এই দেখাটা। আর বিচিত্র বলেই রঙিন। রঙিন বলেই সুন্দর। বিস্ময়কর সুন্দর। এই বিচিত্র রঙিন সৌন্দর্যের টানেই বোধহয় জেমস ব্র্যান্ডন হিন-এর এই দেশে ছুটে আসা এবং অতঃপর বসবাস। ব্র্যান্ডন একজন অভিনেতা ও পরিচালক। আদি বাড়ি ম্যানহাটন। নিউ ইয়র্ক। বর্তমান ঠিকানা আন্ধেরি। মুম্বই। বছর চারেক আগে প্রথম আসে এদেশে। শুরু হয় টুকটাক অভিনয় করা। এই করতে করতেই 'বান্টি অওর বাবলি'তে তাজমহলের ক্রেতার ভূমিকায় অভিনয়। দেড় বছর আগে থেকে পাকাপাকিভাবে মুম্বইবাসী এবং তার নিজের ভাষায়, 'হোয়াইট, ফরেন স্ট্রাগলিং বলিউড অ্যাক্টর।' আমেরিকাবিদ্বেষী আমেরিকান বড় একটা দেখা যায় না। ব্র্যান্ডন তাই নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রম। কড়া ডেমোক্র্যাট ব্র্যান্ডনের রিপাব্লিকান শাসনের কিছুই পছন্দ হয় না। নিজের দেশটাকে সে 'বোকা লোকেদের দেশ' বলে, আর সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপরমহলে যুদ্ধ এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে বিপুল বাণিজ্য ও চুরিচামারি চলে, তার কাছে এই দেশের টুকটাক ঘুষখোর পুলিশ এবং আমলারা তার কাছে শিশু, এমনই তার দাবি। সাড়ে ছ'ফুট উচ্চতার এবং ডব্লিউ ডব্লিউ এফ কুস্তিগিরের দৈর্ঘ্যের এই নাট্য পরিচালক তাই অনেক দেশ ঘুরে আমাদের দেশটাকেই বেছেছেন বসবাস, জীবনধারণ এবং ভাগ্যান্বেষণের জন্যে। উলটপুরাণ বোধহয় একেই বলে! কৈলাসে কেলেঙ্কারিতে তিনি আছেন, নিউ ইয়র্কের এক আর্ট গ্যালারির মালিক, এক ধনী সাহেবের ভূমিকায়। দুষ্টু লোকেরা বলতেই পারে, নিজের দেশে কিছু হয়নি—তাই এই দেশে এসেছে করে খেতে। কিন্তু আমরা 'যদি এই আকালেও স্বপ্ন দেখি?...' যদি ভেবে নিই, যে আমাদের এই অদ্ভুত দেশটার যে রং, যে বিস্ময়, তারই টানে এখানে এসেছে এই সাহেব?—'...কার তাতে কী?'

এবার আসি সেই বিস্ময়গুলোর প্রসঙ্গে, যেগুলো আগে থেকেই ছিল। আমার ফেলুদার বয়স বাড়ে না। প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল দেখছি এই মানুষটিকে, অর্থাৎ

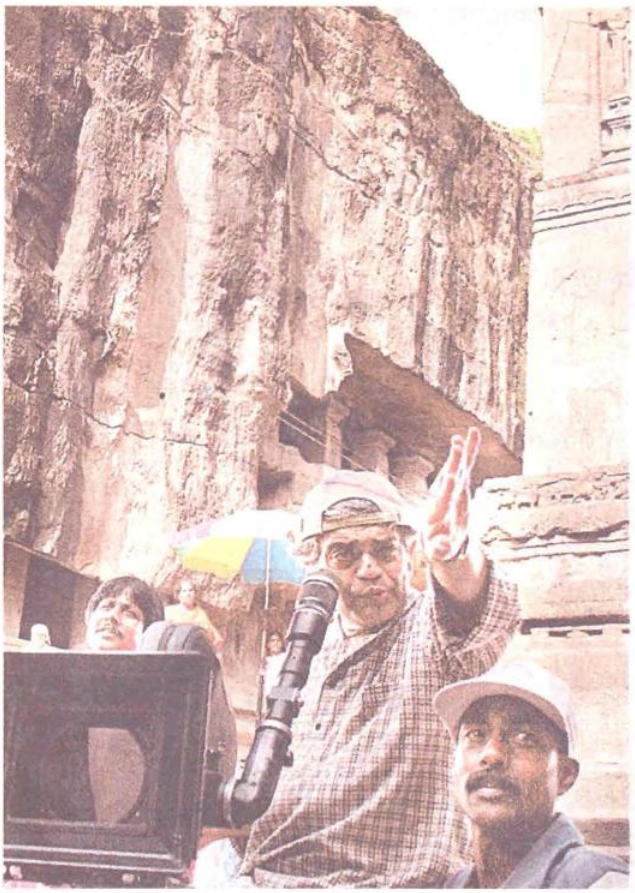

সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। যত দিন যাচ্ছে, ততই সবুজ, ততই দুরন্ত হয়ে উঠছেন তিনি। কিশোরসুলভ জীবনীশক্তির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। শারীরিকভাবে মধ্যবয়সী মানুষটির মনের বয়স উনিশ। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে হইহই করে। সকলের সবকাজে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করে। সিনেমা বানানোর গোটা প্রোসেসটিকে ভীষণ ভীষণভাবে ভালবেসে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়, আমাদের অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের সিনেমাকর্মীদের সত্যিই শেখা উচিত। হাতের কাছে এইরকম একজন অনুপ্রেরণা ছিল বলেই না আমি যে আমি, সেও প্রত্যেকদিন ভোর ছ'টায় উঠে তৈরি হয়েছি!

সিনেমার প্রযুক্তি সংক্রান্ত আমার যা যা প্রশ্ন আছে, বা থাকে তার প্রায় সবক'টির উত্তর আমি পেয়ে যাই বাবুদার অর্থাৎ সন্দীপ রায়ের কাছ থেকে। এটাও আরেকটি বিস্ময়! ফিল্মের উপর ডলবি-র লাইনগুলোর দৈর্ঘ্য ঠিক কত সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে, 'হাই নুন' ছবিতে একটি অ্যাকশন দৃশ্যের জন্যে কীভাবে পঁচিশটি ক্যামেরা একত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার বিবরণ অবধি। যে মানুষটি এত জানেন, তিনি কী করে এত নিরহঙ্কারী এবং ব্যবহারে নির্ভার হন, ভাবতে অবাক লাগে, গোটা ইউনিটে নানা বয়সী নানা মানুষ, ছোট, বড়, সমবয়সী—বাবুদা কিন্তু সকলেরই 'স্যর'। আবার একইসঙ্গে সকলের পরম বন্ধুও বটে। ঠিক তেমনই বাবুদার স্ত্রী শ্রীমতি ললিতা রায়, আমাদের বুনিদি, অনায়াসে আর্নিকা কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হতে পারেন। অভিনেতা থেকে স্পট বয়, প্রযোজক থেকে ফাইট ডিরেক্টর, যে কোনও লোকের কোনওদিন একটু বেশি খাটাখাটনি হলে, অল্পবিস্তর জ্বর, পেটখারাপ, হাঁটু ছড়ে যাওয়া হলে দিবারাত্র তার জন্যে বরাদ্দ বুনিদির, দাদুর দস্তানার মতো ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসা চার দানা আর্নিকার বড়ি। গাড়ির ড্রাইভারের খাওয়া হয়েছে কি না থেকে ইউনিটের কোনও অল্পবয়সী সদস্য দোলনায় দুলতে দুলতে বান্ধবীর সঙ্গে ফোনালাপ করছে—সব দিকে তার তীক্ষ্ণ মাতৃসুলভ নজর।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে—Never ceases to amaze। বাবুদার দুই চিরতরুণ সহকারী, রমেশ সেন এবং সুব্রত লাহিড়ি, ওইরকম দুজন মানুষ—যাদের নিয়ে বিস্ময়ের সত্যিই কোনও অন্ত নেই। প্রথমজন আশি ছুঁইছুঁই. দ্বিতীয়জন সত্তর, কিন্তু গোটা দলের মধ্যে সবথেকে চনমনে, অ্যাকটিভ, প্রায় কিশোরসুলভ যদি কারওর কার্যকলাপ হয়, তাহলে তারা এই দুজন। দু'জনের কাছেই গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সিনেমা'র ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা নানা গল্পের ঝুলি মজুত। আমরা বোধহয় অতদিন ওই জীবনীশক্তি নিয়ে বেঁচেই থাকব না...কে জানে?

প্রযোজকদের তরফ থেকে প্রথমে বাপ্পাদা, তারপর মৌ দি এবং সত্যমদা, আর সবশেষে সুমিতাদি সদলবলে এসে পড়ায় গোটা ব্যাপারটা কখন যেন সকলের অজান্তেই পিকনিক হয়ে উঠল। এইসব হইহুল্লোড়, গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া, প্রচণ্ড সকালে শ্যুটিং শুরু হওয়ার ফলে প্রাত্যহিক শরীরচর্চা না করতে পেরে আমার উসখুস করা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনখারাপী পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা এবং খুব আনন্দে কাজ করা। এসবের মধ্যে দিয়ে কখন যে গোটা শিডিউলটা শেষ হয়ে গেল, টেরই পেলাম না।

এবার পালা মনখারাপের। না, কলকাতায় ফিরতে হবে বলে মনখারাপ নয় মোটেই। কলকাতায় ফিরতে ভালই লাগে। মনখারাপ এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে। গত বাইশদিনের মধ্যে প্রতিদিন তৈরি হওয়া অনেক গল্প, মুগ্ধতা, খিস্তি খেউড়, ঝলমলে সকাল, বিষণ্ণ বিকেল, যেগুলো এখানেই রয়ে গেল। সেগুলোর সঙ্গে আর কোনওদিন হয়তো দেখা হবে না বলে মনখারাপ। মন্দিরগুলো তৈরি করার পর সেগুলো ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কারিগরদের যেমন মনখারাপ হয়েছিল, ঠিক সেইরকম।

জানি, লেখাটা মোটেও তোপসেসুলভ হল না। ডায়রি লেখা তো হলই না। কী করব? আসলে তোপসের মতো করে লেখা যায় না যে! তাই বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বিস্ময়। কিছু মুগ্ধতা আর কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম। বাড়াবাড়ি হলে মনে মনে আমাকে কোনও কোনও পাঠক হয়তো 'বিস্ময়বালক' বলে ভেবে বসতে পারেন। আপত্তি নেই।

যতদিন বিস্ময় আছে, অবাক হওয়া আছে, মুগ্ধ হয়ে চোখে জল চলে আসা আছে, ততদিন আছি। যেদিন এইগুলো শেষ হয়ে যাবে, সেদিন আর বেঁচে থাকার কোনও মানেই থাকবে না।

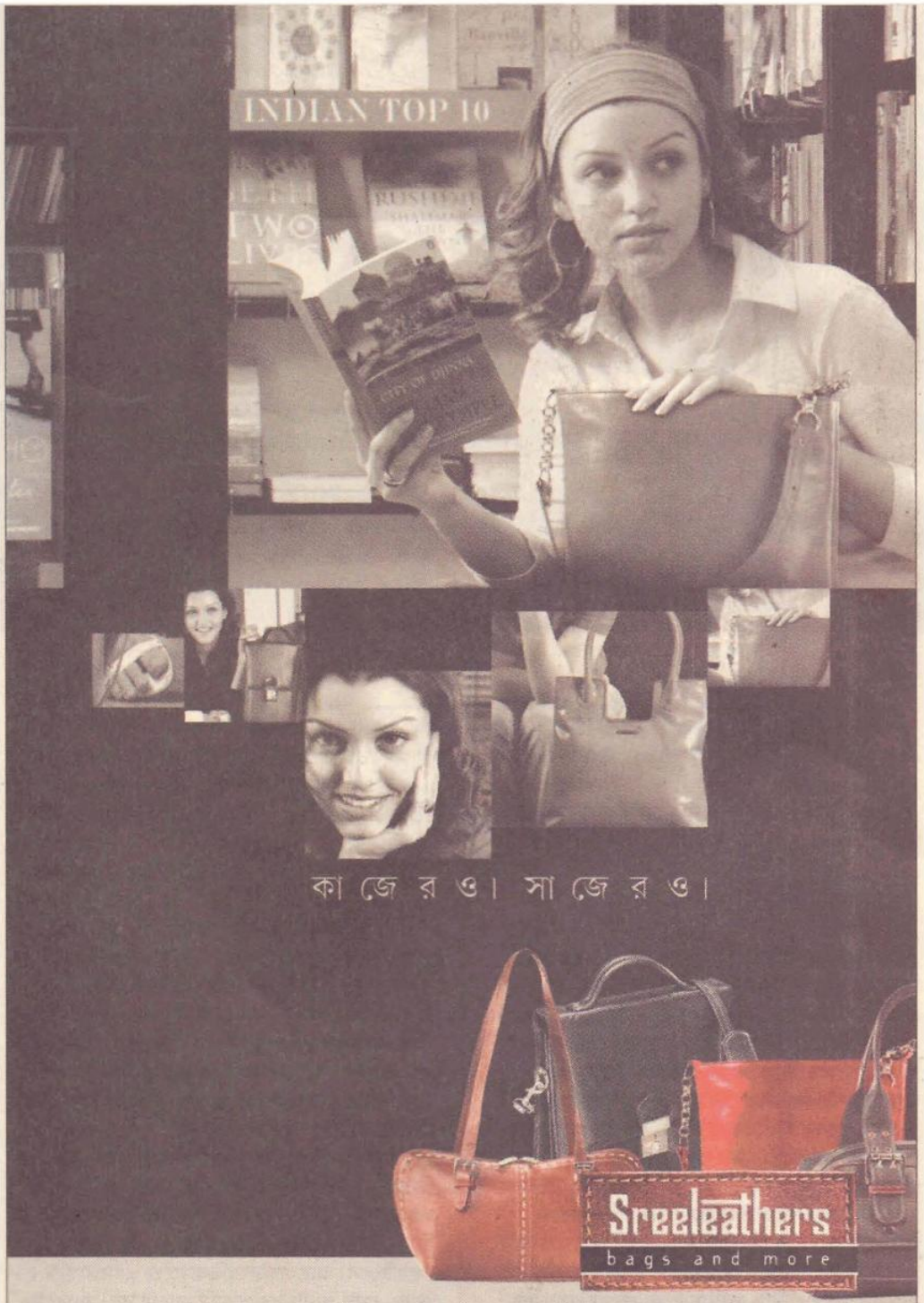

১৯টাকা থেকে ৪৩১৯টাকা। লেডিজ় ব্যাগ। ক্লাচ। পার্স। মেকআপ বক্স। জুয়েলারি বক্স
টয়লেট ব্যাগ। শপিং ব্যাগ। ট্রাভেল ব্যাগ। স্ট্রলি ব্যাগ। স্কুল ব্যাগ
স্পোর্টস ব্যাগ। ওয়েস্ট পাউচ। বেল্ট। ওয়ালেট। ব্রিফকেস। পোর্টফোলিও...

কলকাতা। লিন্ডসে স্ট্রিট ~ ২২৮৬ ১৫১১। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ~ ২২৮৬ ১৫০৬। কলেজ স্ট্রিট মার্কাস স্কোয়ার ~ ২২১৯ ৭৯৮৪
বেহালা মার্কেট ~ ২৪৬৮ ১৩৪১। গড়িয়া বসু মার্কেট ~ ২৪৩০ ৩০৭৬। হাওড়া কর্পোরেশন স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স ~ ২৬৪১ ০৬০৮
ডোমজুড়। নৈহাটি। বর্ধমান। দুর্গাপুর। আসানসোল। বহরমপুর। পুরুলিয়া। জামশেদপুর। ধানবাদ। রাঁচি
হাজারিবাগ। ভাগলপুর। মজফফরপুর। পাটনা। কটক। ভুবনেশ্বর। আগরতলা। বারাণসী। রায়পুর। গুয়াহাটি। দিল্লি

ResponseIndia.Com

তোপসের রুকস্যাক

ফেলুদার সঙ্গে বেই বেই। সঙ্গে জটায়ুর টুকটাক। এই পুজোয় না হয় আপনিই তোপসে।

অর্পিতা চৌধুরী

ফেলুদার প্রথম অভিযানই পাহাড়ে। ১৯৬৫-তে লেখা 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'র পটভূমি বাঙালির প্রিয় দার্জিলিং। এই গল্পে দার্জিলিঙের ম্যাল, স্যানাটোরিয়াম আর কিউরিও শপ-এর চারপাশেই কুয়াশার মতো রহস্য জট পাকিয়েছে। দার্জিলিং ঘোরার শখ ষোলোআনা পূর্ণ হয়েছে 'দার্জিলিং জমজমাট' অভিযানে। জলাপাহাড় রোড, কেভেন্টার্স, ম্যাল, পাংখাবাড়ির প্যাঁচানো রাস্তায় প্রতি পদে জমজমাট হয়েছে রহস্যের প্যাঁচ আর ক্ষুরধার হয়েছে ফেলুদার বুদ্ধির মারপ্যাঁচ।

ফেলুদা গ্যাংটকে গিয়েছিল তোপসেকে নিয়ে। তখনও লালমোহনবাবুর আবির্ভাব হয়নি। এই অভিযানে রহস্যের বুনন রুমটেক মনাস্ট্রির লামাদের নাচের মতোই বর্ণময়। বেড়াতে গিয়ে জড়িয়ে পড়া এই রহস্যের জট নাটকীয়ভাবে খুলে যায় পেমিয়াংশির কাছে এক বাংলোতে।

সিমলায় ফেলুদা অ্যান্ড কোং আবার বেশিদিন থাকেনি। ধমীজার বাড়িতে তাঁর পাল্টাপাল্টি হয়ে যাওয়া ব্যাগ পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে হয়। এই ধমীজার বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় বরফে মোড়া রাস্তায় রহস্যের যবনিকা পতন। দেশের মধ্যে আরও মোক্ষম দুটো হিল স্টেশন চষে ফেলেছে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। তারমধ্যে একটা কাশ্মীর আর একটা কেদারনাথ। 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' নামে ফেলুদার অভিযান পাঠকমহলে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। কিন্তু প্রায় দু'দশকেরও বেশি আগে লেখা এই অভিযানের মূল আকর্ষণ ডাল লেকের বুকে হাউস বোটে প্ল্যানচেট আর পহেলগাঁওতে পাহাড়ের ঢালে তাঁবুতে থেকে রহস্য উন্মোচন।

তীর্থস্থান কেদারনাথেও রহস্য ফেলুদাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে'—এই অভিযানে গিয়ে লালমোহনবাবু তাঁর গৃহত্যাগী ছোটকাকাকে খুঁজে পান। তিনি বহু বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আর একটা অভিযান তো এখন একদম হট কেক। সেটা পুরোদস্তুর পাহাড়ি জায়গা নয়। মহারাষ্ট্রের অজন্তা-এলোরায় ফেলুদা অ্যান্ড কোং-এর মারকাটারি অভিযান আগামী শীতের ছুটিতে এই শহরের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে।

ফেলুদার এই অভিযানগুলোর পিছনে পরিচালক সত্যজিতের অবদান অনস্বীকার্য। সিমলায় গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমার শ্যুটিং করতে গিয়ে ফেলুদার গল্পের প্লট ভাঁজেন সত্যজিৎ রায়। আপনার কাছে গুগাবাবার

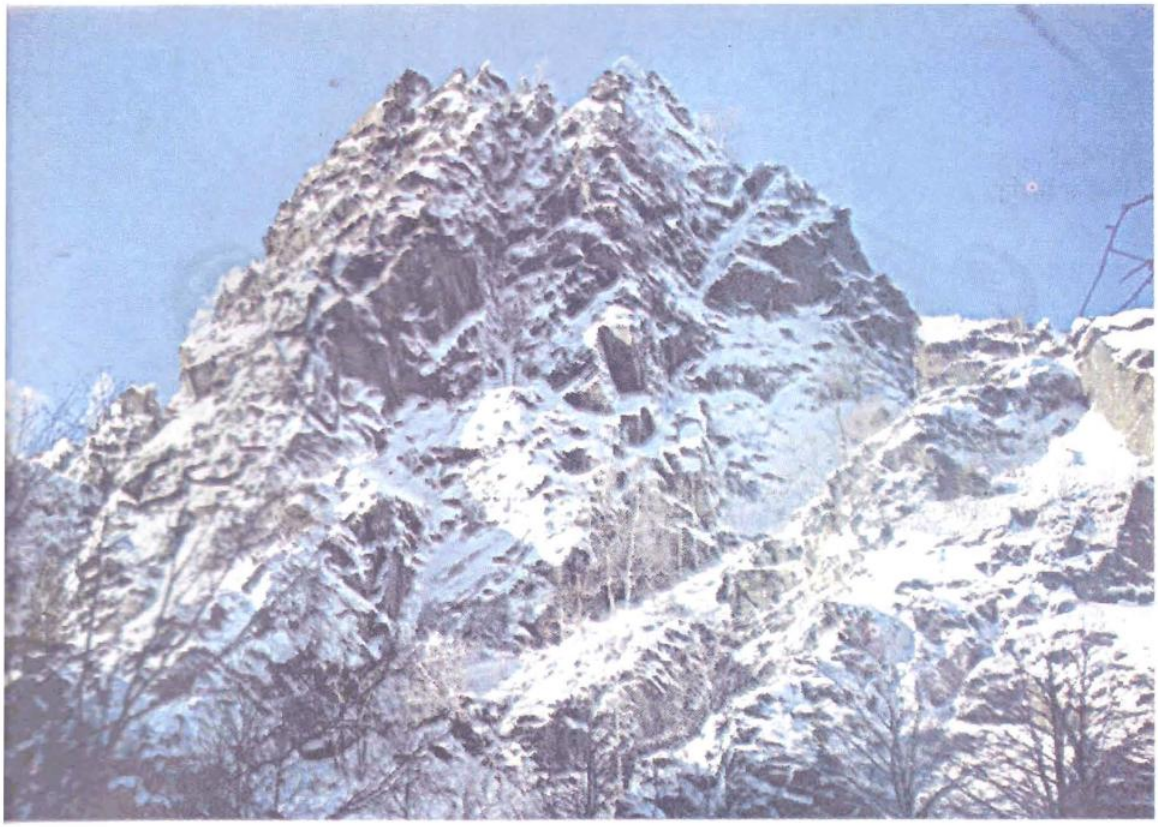

জুতোজোড়া নেই ঠিকই। কিন্তু মনে তো ইচ্ছে আছে ষোলোআনার জায়গায় আঠারোআনা। এবার পুজোয় যদি মিস হয়ে যায়, কুছ পরোয়া নেহি। সামনের শীতের ছুটির জন্য তৈরি হোন। কাঁধে নিন রুকস্যাক, ব্যস এবার পায়ের তলায় সর্ষে।

স মু দ্র

সাগরতটে ফেলুদার অভিযানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হিট অবশ্যই 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে।' এই গল্পের ছায়ায় চাপা পড়ে গিয়েছে 'হত্যাপুরী' আর 'নয়ন রহস্য'। প্রথমটা পুরীতে আর পরেরটা মাদ্রাজে, থুড়ি আজকের চেন্নাইয়ে। কিন্তু এই দুই অভিযানেই সমুদ্রকে ছাপিয়ে হিরো হয়ে গিয়েছে অন্য কেউ। হত্যাপুরীতে বালির ওপর অদ্ভুতদর্শন পায়ের ছাপ আর নয়নরহস্যতে নয়নের বিরল ক্ষমতা। আসলে মুম্বই ছাড়া অন্য দুটো ক্ষেত্রে পাহাড়ের মতো সমুদ্র ফেলুদার জন্য অতটা ক্লিক করেনি। কিন্তু কে বলতে পারে আপনি হয়তো ফেলুদা পড়ে এই জায়গা তিনটে নতুন করে আবিষ্কার করলেন!

ম রু ভূ মি

মরুভূমির ধু ধু প্রান্তরকে নরমসরম বাঙালির কাছে হট ফেভারিট করেছে ফেলুদা। 'সোনার কেল্লা'র আগে ক'জন পুজোর ছুটিতে রাজস্থান যেত বলুন তো? আর রাজস্থান গেলেও বেশিরভাগ পর্যটক জয়শলমীরকে এড়িয়ে চলতেন। ইদানীং পুজোর ছুটিতে বাঙালিদের পছন্দের লিস্টে রাজস্থান টপার। অবন ঠাকুরের রাজকাহিনীর পর সোনার কেল্লাই রাজস্থানের দ্বিতীয় আইডেনটিটি। অন্তত সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়া বাঙালির কাছে তো বটেই। পেটরোগা বাঙালিকে মরুবিলাসী করে তোলার জন্য হ্যাটস অফ টু থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

বি দে শ

ফেলুদার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ নেপালের কাঠমাণ্ডু। মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে ফেলুদা, বিশেষত আঙ্কল লালমোহনবাবুর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। এবার পুজোয় কাঠমাণ্ডু বেড়ান, ক্যাসিনো খেলুন, শপিং করুন। তবে একটাই সতর্কবাণী—গোলমেলে জপযন্ত্র থেকে সাবধান। ফেলুদার অভিযানে তার মধ্যেই ছিল চোরাই জিনিস। আর ব্রাউন শুগারের জেরে আঙ্কলের...মনে আছে তো? নিরাপদে নেপাল ঘুরে এসে বলুন, হুম! ওঁ মণিপদ্মে হুম!

আরও দু'বার দেশের বাইরে পা রেখেছে ফেলুদা-বাহিনী। 'টিনটোরেটোর যিশু' অভিযানে হংকং আর 'লন্ডনে ফেলুদা' গল্পে লন্ডন।

এখন তো ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলো অ্যাফোর্ডেবল বাজেটে বিদেশে নিয়ে যায়। সুতরাং ভেবে দেখুন। এবার নিউটাউনে জমির প্লট বুক না করে বিলেত পাড়ি দেবেন কি না। হংকং-এ গিয়ে দোকানের বিশাল বিশাল লম্বাটে হোর্ডিং দেখে আবার লালমোহনবাবুর মতো ভড়কে যাবেন না যেন। মাথায় রাখবেন, চিনা ভাষা সবসময় ওপর-নিচে লেখা হয়। আর লন্ডনে গিয়ে মাদাম ত্যুসার মিউজিয়ম ঘুরে আসার পর অবশ্যই যান বেকার স্ট্রিট-এ। খুঁজে বের করুন ২২১ বি নম্বরের কাছাকাছি কোনও বাড়ি। ফেলুদার মতোই একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসুন লং কোট আর হ্যাট পরা তাঁর গুরুদেবকে।

রো
রোববারের
রামপ্রসাদী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

আঠারো

জলপথে জলঙ্গি ভাঙতে ভাঙতে রামপ্রসাদ ইতিকথায় চলে যান বারেবারেই। সেই সব কথন কভু প্রক্ষিপ্ত কভু সংবদ্ধ।

এই যেমন এখনই তাঁর মনে হল সদ্য ফেলে আসা গঙ্গার কথা। আর অমনি কথা হল, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে গঙ্গার জোয়ার নবদ্বীপ পর্যন্ত আসত। এখন সেটি কালনার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে যায়।

রামতনু আর ভজহরি একে অপরের মুখ তাকাতাকি করে।

রামপ্রসাদ নিচু স্বরে বলে যান, জানিনে এত সুখী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নসীবে কি আছে। তবে তাঁর পূর্বপুরুষরা ভারী হেনস্থা আর দুঃখভোগ করে গিয়েছেন। যেমন কিনা রাজা রামকৃষ্ণ যবনদের অত্যেচারে কারাগারে মরণদশা পেলেন। তাঁর গত হওয়ার সময় এই নদের সিংহাসন নিয়ে সে কি ডামাডোল। রামকৃষ্ণের পুত্রাদি ছিল না। ফলে সিংহাসন নিয়ে মহাঘোর উপস্থিত। সে সময়, আর এক নামে যবন কিন্তু কর্মে মানুষ, রাজা রামকৃষ্ণের পরম সখা সাজাদা আজিম ওসান করলেন কি শাসক জাফর খাঁর ওপর এক পরোয়ানা জারি করে ঘোষণা দিলেন, নদীয়ার রাজ্যপাট তাঁর ছেলেপুলে না থাকার কারণে দত্তক পুত্র বা ওই ধরনের কোনও আইনি বেক্তিকে যেন দান করা হয়। এর উত্তরে জাফর খাঁ পত্র লিখে বললেন, যেহেতু রামকৃষ্ণের বংশ লোপ পেয়েছে তাই রাজসম্পত্তি যেন কোনও রাজকর্মচারীকে দান করা হয়। এখানেই জাফর খাঁ নিজের কলে নিজে পড়লেন। তিনি আবার পত্র লিখলেন, রাজা রামকৃষ্ণের বড় ভাই রামজীবনকে যিনি বহুদিন বরাবর ঢাকায় বন্দীদশা পার করছেন, অনুমতি হলে তাঁকেই নদীয়ার সিংহাসনে বসানো যায়। সাজাদা আজিম ওসান এ কথায় রাজি হলেন। রামজীবন অবশেষে জাফরখাঁর কাছে বিস্তর মুক্তিপণ দাখিল চুক্তি করে নদের সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু মন্দবরাত, যথাসময়ে কড়ার করা টাকা না দিতে পারায় জাফর খাঁ আবার রামজীবনকে কয়েদ করলেন মুরসিদাবাদে। এই সময় আলি মহম্মদ আর কালু জমাদার বলে দুই যবন সেনার সাহায্য নিয়ে রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ বিদ্রোহ করে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গেশ্বরের অধিকার স্বীকার করলেন আর বীরকাটি, নারায়ণ গড়, দেবীনগর ইত্যাকার জায়গায় অনেক দুর্গ বানিয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা দিলেন। নবাব মুরসিদকুলী খাঁ তাঁকে দমনের জন্যে লহুরীমল্ল ইত্যাদি সেনাপতি দিগরকে পাঠালেন। তখন কয়েদবাসী রাজা রামজীবনের উপযুক্ত ছেলে, ভারী বলবান আর সাহসী যুবরাজ রঘুরাম নিজের ইচ্ছেয় পড়ে সেনাপতি লহুরীমল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ধেয়ে গেলেন। যুদ্ধ করলেন মহা তেজে। তাঁর বাহুবলে আর যুদ্ধবুদ্ধিতে আলি মহম্মদ প্রাণ হারাল। বিদ্রোহ দমনের কাজ ফুরলে নবাব মুরসিদকুলী তাঁর প্রিয়পাত্র রঘুরামকে রাজসাহীর মস্ত জমিদারি মহাল লিখে পড়ে দিলেন। এই রঘুরামই হলেন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তখনকার বাংলার সদর কানুনগো দর্পনারায়ণের কর্মচারী ছিলেন। রঘুরামের বন্দী বাপ রামজীবন—বাড়তি তোফা হিসেবে কয়েদ থেকে মুক্তি পেলেন। বাপের মরণ হলে পর এই রঘুরাম টানা তেরো বছর রাজত্ব করেন। মরণকালে গঙ্গাতীরে তাঁর অন্তর্জলি হয়। এই রঘুনন্দনের উপযুক্ত পুত্তুর রাজা কেষ্টচন্দরের নেমন্তন্ন রক্ষে করতে এখন আমরা যাচ্ছি। বুঝলে তো।

রামতনু বিস্ময়ে উক্তি করেন, রঘুরাম না হয়ে ভীমরাম হলে ভালো ছিল।

—হ্যাঁ, তোমাদের তো আগেই বললাম, রঘুরাম মহা বলবান ছিলেন। সেই বলবানীর গপ্পো শোনো একখানা। একবার হল কি, মুরসিদাবাদের নবাব বাড়িতে দু'জন প্রসিদ্ধ মল্লবীর এসেছেন। নবাব দেখলেন এই জোড়া পালোয়ানের সঙ্গে লড়তে পারে এমন কেউ নেই। তখন নবাব রঘুরামের কাছে পত্র লিখলেন, দু'জন মল্ল পাঠাতে বলে। বৃত্তান্ত পড়ে স্বয়ং রঘুরামই এসে উপনীত। নবাব শুধোলেন, তোমার বীর জোড়া কোথা? তিনি বললেন, তারা নিকটেই আছে। এই না বলে তিনি নিজের গা থেকে জামা আর মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে নিজেই রণভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সুমুখে দণ্ডায়মান দুই মল্লবীর। তিনি অমনি সামনে এগিয়ে গিয়ে দু'জনার গলা নিজের দু'বাহুতে বদ্ধ করে ফেললেন। ওই অবস্থাতেই রঘুরাম দাঁড়িয়ে আছেন। তারাও নড়ে না, চড়ে না। নবাব ব্যাপার দেখে তো অবাক। তিনি বলে উঠলেন, কি হল, যুদ্ধ কর! তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তারা পঞ্চত্ব পেয়েছে।

রামতনু উৎসাহে বলে ওঠেন, তাহলে নামটা খুব একটা ভুল বলিনি ভায়া।

জলঙ্গি বরাবর আরও খান তিন-চার নৌকা এসে পড়ে। তারা যেহেতু লম্বা আর আড়ায় বড় তাই এই নৌকার সমানে সমানে ধরে ফেলে পিছন হতে। সেই সব নৌকায় টিকিধারী পণ্ডিতের পাল। ভজহরি নাওয়ের মাঝিদিগে একে একে শুধোয়—কে কোথা হতে আসছে। কেউ বলে গুপ্তিপাড়া, কেউ ভট্টপল্লী, মূলাযোড় ইত্যাদি। ভজহরিকে ওদিকের নাও থেকে প্রশ্ন হয়, তোমরা কোথা থেকে আসছ গা?

পাশের নাওয়ের মাঝি মাল্লা জোরে জোরে দাঁড় মারে। ফলে তারা কতক সাঁ করে সামনে এগিয়ে যায়। এগোয়, আর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের নৌকা যাত্রী দিগরের দিকে আড়ে আড়ে চায়

—আজ্ঞে কুমোরহট্ট—হালিসহর।

—হুঁ, সে তো মহা মহা পণ্ডিতদের দেশ। তা তোমাদের নাওয়ে কে যান?

রামতনু হেসে কন, এখেনে কোনও পণ্ডিত নেই। সব গো মুখ্যু।

—তা রাজবাড়ি যাওয়া হচ্ছে কোন কামে?

—নাচ-গান করতে ভায়া।

ওদিক থেকে খানিক অছেদ্দার সুর আসে, অ বুঝিচি। নাটুয়ার দল। তা ভাল, তা ভাল। তা কি পালা গাওয়া হবে শুনি?

ভজহরি গোমড়া বদনে বলে, ছিকেষ্টর বস্ত্র হরণ।

—বলো কি, বলো কি! এ যে উল্টোপালা!

ভজহরি এবার বিরক্তি চেপে রাখতে না পেরে বলে, আমরা সব উল্টো দেশের লোক তো। তাই আমাদের পালাপত্তরও উল্টো।

—বটে বটে। তাহলে পালাটি শুনতে হচ্ছে বটে।

কথা বলা নাওখানি এগিয়ে যায় তরতরিয়ে। ধেয়ে আসে পাশাপাশি আর এক নৌকা।—কি গা ভায়া, তোমরা আসছো কোথা হতে?

আগে থাকতেই বিরক্ত ভজহরি বলে, কলকেতা।

—বাপরে, কলকেতা—মানে সমুদ্দুরের নিকটে।

—যথাত্থ কয়েছেন বটে মশায়।

—তা তোমাদের বাটি থেকে সমুদ্দুর কদ্দুর শুনি?

—আজ্ঞে এধারে দাওয়া, তারপর ঘরদুয়ার মধ্যিখানে উঠোন। উঠোন শেষে হেঁশেল। ঠিক তারপরেই সমুদ্দুর।

—বলো কি ভাই!

—ওই কথাই বলি। সমুদ্দুরে জোয়ার এলে আমাদের উঠোন সমুদ্দুর হয়ে যায়। ঘরের দাওয়া প্রায় ডুবু ডুবু।

—কী কাণ্ড!

—হুঁ, কাণ্ড বলে কাণ্ড। আমরা সব দাওয়া থেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরি।

—সমুদ্দুরে ছিপ! অতো সব মস্ত ঢেউ। তার মধ্যে ফাতনা ভাসবে কেমনে?

—ফাতনা লাগে না তো। মাছ এমনিই খেয়ে বসে থাকে।

—বাপরে, তা কিসের টোপ দাও শুনি?

—আজ্ঞে ভারী সোজা কথা। চাঁপা কলার টোপ দিই কত্তা।

—মাছ খাবে নিরিমিষ্যি চাঁপা কলা! কি আশ্চয্যি কথা।

আজ্ঞে কলকেতা স্থানটিই তো আশ্চয্যির পীটস্থান।

—হুঁ, কালীঘাট তো একটি পীঠ জানি। তা তোমাদের ঘরখানি কোন পীঠ শুনি?

—ওটি হল গে আপনার বোয়াল পীট।

—বোয়াল পীঠ! নাম শুনিনি তো বাপের জন্মে!

—শুনবেন কি করে। কলকেতা না গেলে, নিজ চক্ষে না দেখলে, তবে কিনা চক্কু কন্নের বিবাগ ভঞ্জন হবেটা কেমন করে।

—তা ভায়া এমন নাম কেন?

—ওই যে বল্লাম—সমুদ্দুরের ধারে এই পীটস্তান। আর মাছ বলতে শুধুই তাগড়া তাগড়া বোয়াল মাছ। বোয়াল আবার চাঁপা কলা ছাড়া ভিন্ন কোনও টোপ পছন্দ করে না।

—এতদিন জানতুম বোয়াল আমিষ খায়। মানে জলে ভাসা মড়া তেনার ভারী পছন্দের খাদ্য।

—হা ভগবান, এটাও জানেন না, চাঁপা কলা য্যাতক্ষণ আস্ত থাকে ত্যাতসময় সে নিরিমিষ্যি। তার খোসা যেই না ছাড়াবে অমনি সেটি এক্কেবারে গো-মাংস।

—ছ্যা ছ্যা ছ্যা। এরা কেরে!

পাশ থেকে আর এক সওয়ার বলে, কলকেতার লোকগুলো সব গোলমেলে দাদা। শুনিচি জায়গাটি আরও গোলমেলে। ওখানে নলবনে দিবসেতে সব শাঁকচুন্নী, বেম্মদত্যি ঘুরে বেড়ায়। দিনমানেও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

যে এতক্ষণ কথা কইছিল, সে এবার দ্বিতীয় জনের প্রতি চাপা গলায় বলে, যাদের সঙ্গে অ্যাতো কথা কইছি তারা আবার তেনাদের অংশ নয় তো!

ভজহরি আকাশ ফাটিয়ে হো হো হেসে ওঠে।—রাম রাম বলো দাদাগণ, রামরাম বলো।

পাশের নাওয়ের মাঝি মাল্লা জোরে জোরে দাঁড় মারে। ফলে তারা কতক সাঁ করে সামনে এগিয়ে যায়। এগোয়, আর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের নৌকা যাত্রী দিগরের দিকে আড়ে আড়ে চায়।

রামপ্রসাদ এতসময় কোনও কথা বলেননি। তিনি হাস্য দমন করে এই কথোপকথন উপভোগ করছিলেন। এবার আর থাকতে না পেরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন,

গজাহ্বপিপ্পলীমূলব্যোষামলকসর্ষপান।
গোধানকুলমার্জারঋক্ষপিত্তপ্রভাবিতান। নস্যাভ্যঞ্জনসেকেষু বিদধ্যাদ্‌যোগতত্ত্ববিৎ।।

ভজহরি এবং রামতনু এই হঠাৎ চিৎকৃত খটমট সংস্কৃত বাক্য শুনে প্রায় একত্রে চক্ষু কপালে তোলে। রামতনু বলে ওঠেন, সব্বোনাশ। তাহলে কি সত্যিই আমাদের ভূতে ধরেছে! এ কি ভূত তাড়ানো মন্তর!

রামপ্রসাদ নির্বিকারে বলে যান, গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকুট অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এবং আমলকি ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য একত্র করে গোসাপ, বেজি, বিড়াল ও ভল্লুকের পিত্তে ভাবনা দিয়ে মেশাতে হবে। এই ঔষধ নস্যে, অঙ্গমর্দনে ও স্নানে প্রয়োগ করবে। তাহলে ভূত ছেড়ে যাবে।

বেলা দুপুরে দেশ অর্থাৎ বর্ধমানের ধুলুক গ্রাম থেকে একে উপনীত আমাদের কামাখ্যা কাকা। কাকা, মানে আমার দাদুর অকালে চলে যাওয়া ভাইয়ের বড়ো পুত্র। খর কালো গায়ের রং, রোগা কঞ্চি, আর মোটামুটি ঢ্যাঙা। তবে কিনা অকারণেই একটু সামনে ঝোঁক প্রাপ্ত। মাথায় উশকো খুশকো মিশ কালো চুল। ভাঁটা ভাঁটা গোলাকার চক্ষু। লম্বা লম্বা কান আম আঁটি মুখে। আর বাঁ গালে আব কাটানো প্লাস চিহ্ন।

কামাখ্যা কাকার ধুতি-পাঞ্জাবি পটকিলে। পায়ে বুট জুতো। আর দু-হস্তে দু-খানি চটের থলে। কাকার নানান গুণের মধ্যে কানে ভারী কম শোনে। তবে আকথা দিব্যি শুনে নেয়। আমার ইঞ্জিনিয়ার আর সরল পাগলা বড়মামা আমাদের বাড়ি এলে যদি কাকার সাক্ষাৎ পায় তো অমনি তার পশ্চাতে। প্রথমেই উক্তি, কামাখ্যা—গাল ফুলিয়ে তামাক খা।

কামাখ্যা কাকার আরও একটি গুণ—তার কথার আড়ষ্টতা। এই চল্লিশ পার বয়েসেও আধো আধো কথা কয়। যেমন, আমার দাদুকে জ্যাঠামশাইয়ের বদলে অক্লেশে জাতামছাই। আমার প্রপিতামহি বড়মাকে ঠাকুমার বদলি খাক্‌মা। তবে আমার বাবা-মাকে দাদা-বউদি বলতে সেরকম অসুবিধে নেই। কাকা আমাদের ভাগের দেবত্র আর বাদবাকি যাবতীয় ভূসম্পত্তি, পুকুর, ভোগ করে সপরিবারে। মাটির বাড়ি ভেঙে আমার ঠাকুর্দার তৈরি করা পাঁচিল ঘেরা একতলা বেশ বড়ো-সড়ো পাকা দালান কোঠায় স্ত্রী, চারচারটি পুত্র আর গোটা পাঁচ কন্যা সমেত বসবাস করে। সাবেক ইঁদারার মহা হজমি জল পান করে। দু-বেলা সিদ্ধেশ্বরী মাতাঠাকুরানীর পুজো করে। পুজোর মন্ত্র একেবারেই স্বরচিত আর বিচিত্র অদ্ধস্ফুট সুরারোপিত। যথা, মা মা, আমি মন্তর তন্তর জানিনে মা, আমি কিস্যু জানিনে, মা মা গো, মা লক্‌খী, মা কালী, মা, আমার দাদা কানু মুকুজ্যে, ছালা ভারী খচ্চর। ও ছালাকে টাইট দেমা। কানুবাবুর পক্ষেঘাত করে ছেড়ে দে মা। তোমার ছেবা করা নিয়ে, তোমার জমি নিয়ে, দাদা ছালা থাকে থাকেই আমার পেছুতে লাগে মা।

দেবীকে ভোগ নিবেদনের মন্ত্র বলতে, মা গো মা, খাও মা, পেট ভরে খাও গো মা....

কামাখ্যা কাকা এসেই ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম সেরে নিল দাদুকে। আমার বাবা বাড়ি নেই। থাকলেও বাবা কারোর প্রণাম নেয় না, এমনকি বিজয়া দশমীতেও আমাদের, মানে ছেলেমেয়েদের তরফ থেকেও নয়। কাকা এবার আমাদের ভেতর দালানে উবু হয়ে বসে চটের থলে থেকে হরেক সামগ্রী বার করতে লাগল। খবরের কাগজে দড়ি দিয়ে বাঁধা শুকনো পাকা কুল, মা কালীর দরুণ-পাওনা একখানি লালপেড়ে শাড়ি, একজোড়া শালগ্রাম শিলায় মোড়ার আধহাতি গামছা, খানিকটা বোগড়া লাল লাল আউশ চাল—মুড়ি ভাজার জন্যে, এক খাবলা পাকা তেঁতুল, একজোড়া চালতে, আর কলাপাতায় মোড়া মা সিদ্ধেশ্বরীর বাতাসা প্রসাদ, আর চরণপুষ্প। সবশেষে এক ডিবে সিঁদুর মা'র জন্যে।

কাকা এসব বার করতে করতে আমার মা'র দিকে তেরছা চোখে বলে, বাইরের ঘরে দেখলুম ছেই ছব্বোনেছে সুয্যিকুমার দাদু।

মা গলা চেপে বলে, আস্তে কামিখ্যে। উনি শুনতে পাবেন যে।

—ছুনলেন তো ভারী বোয়ে গেল। তা আপনি কেমনধারা লোক বউদি। ছংছারে ছেলেপুলে নিয়ে বাছ করো। আর ঘরে কিনা ছাক্ষাৎ কাল রোগ।

মা বলে, একে কালরোগ বলে না কামিখ্যে।

ঠিক তখনই দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ওদিকের দরজা দিয়ে বড়মা থপথপিয়ে এসে পড়েন। আর এধারে বাইরের ঘরের দরজা ঠেলে সূর্যকুমার লুঙি সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে আসেন।

বড়মা কাকাকে দেখে আহ্লাদে বলে ওঠে, অ মা, আমার কামিখ্যে যে। কখন এলি রে।

কাকা লম্ফ দিয়ে প্রায় তাঁর পায়ে দু-হাত একত্রে ছুঁইয়ে পেন্নাম করে। তারপর সেই হাত দু'খানা জিভে ছোঁয়ায় চুক্ শব্দে।

—খাক্‌মা, খাক্‌মা, কেমন আচো আপনি।

—আর আছি ভাই। সব্বাঙ্গে ব্যতা। কোমর বেশিক্ষণ

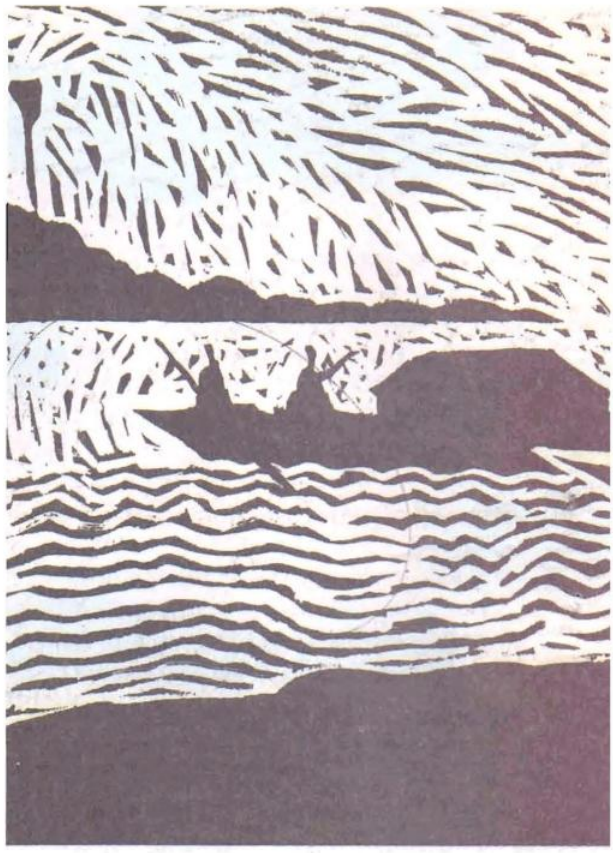

সিধে রাখতে পারিনে। কবে যে ভগবান আমায় গেরণ করবেন।

—ছি ছি। ছাট ছাট। ও কতা বোলতে আচে।

—ও মা, বলব না। আমি কি আজগের মানুষ। নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রেজনাথ বিদ্যেরত্ন বলে আমার দা-মশাই। আমার মাতরি দেব্যার সাক্ষেৎ বাপ। তিনি বিদ্যেসাগর মশাইয়ের চে বয়েসে বিস্তর বড়ো ছিলেন।

কামাখ্যা কাকার চোখ পড়ে এবার অসাব্যস্ত সূর্যকুমারের দিকে। অমনি কালো বদনে ঘোরতর কালোর ছপটি পড়ে। কাকা কিছু বলার আগেই সূর্যকুমার তাঁর সদাই জলকাটা অক্রুবক্র ড্যাবা চক্ষু ভাসিয়ে বলে ওঠেন, কি খবর কামিখ্যে। এই অবেলায় কি মনে করে।

কাকা এরকম সরাসরি বাঁকা তীরের জন্যে তৈরি ছিল না। মা সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বলে ওঠে, না দাদু, অনেকটা দূরের পথ তো।

সূর্যকুমারের বক্র চোখ এবার মার দিকে, থাক থাক, তোমায় আর ধুলুকের পথ চেনাতে হবে না আমার। আমিও সেখেন থেকেই এসেছি তোমাদের এখানে। একেবারে কাক ভোর থাকতে।

কামাখ্যা কাকা, এবার কথা বলে, একে কানে খাটো, তার ওপর খোঁচাটা কানে গিয়েছে। কি করব দাদু, আপনার মতো ছংছার ছাড়া তো হতে পারিনে। আমায় তো কাজ কম্মো করে খেতে হয়।

—কাজ বোলে কাজ। পরকে ঠকিয়ে দিন কাবার। লোককে মাদুলি বিলি করে অর্থ রোজগার। আর অকাজ বলতে, এই বাজারে ন-নটি ছেলেপুলে। পেত্যেক বছর বউয়ের গব্বোধারণ।

বড়মা গলা তুলে বলে, দুকুর বেলা, ছেলেটা তেতেপুড়ে এল। এসব কি অনাছিস্টি কতা।

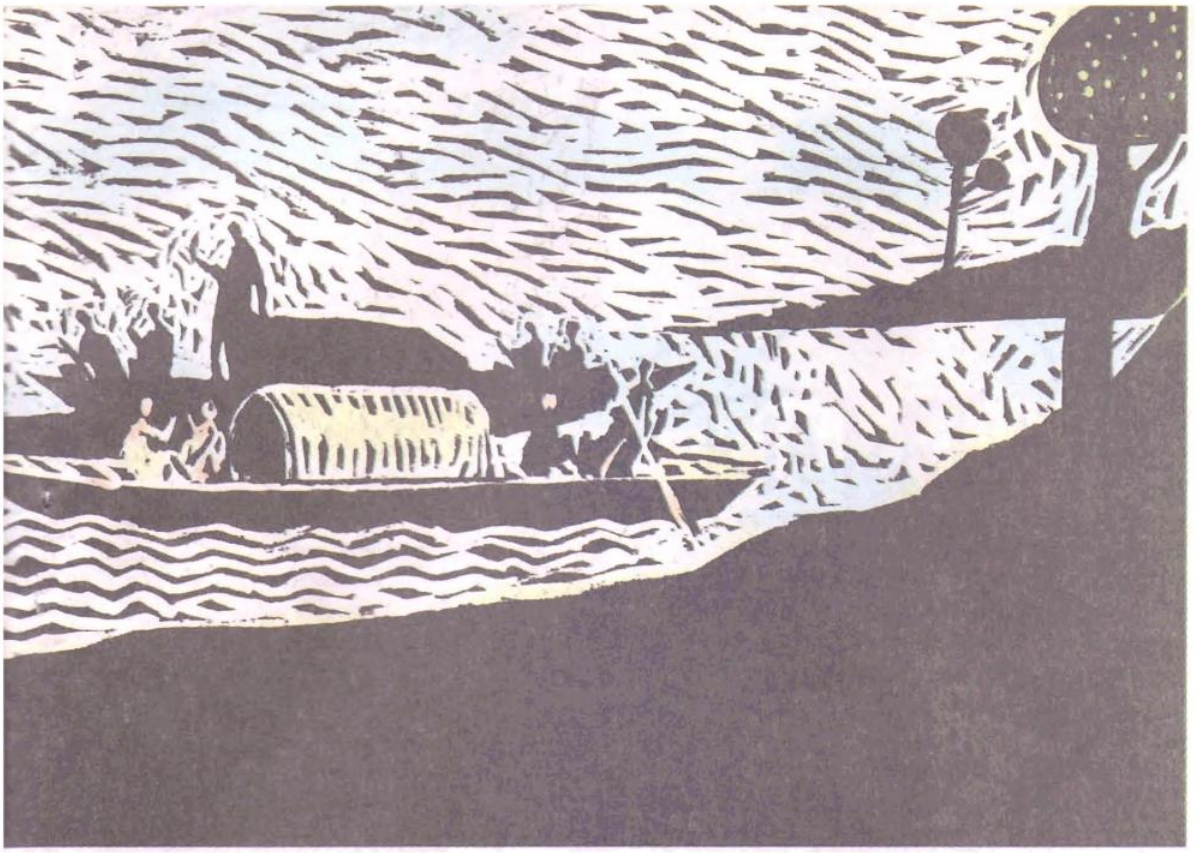

কাকাও গলা তোলে, তাতে আপনার কি দাদু। গুরুজন মানুষ, কিছু বলতে পারিনে তো।

—কি করবি! কি করবি রে হারামজাদা। বল দিকিনি, বল।

লুঙি সামলাতে সামলাতে সূর্যকুমার কামাখ্যার দিকে ধেয়ে যান। মা মাঝখানে এসে কোনওমতে তাঁকে সামলায়। থাক দাদু থাক। রাগ করবেন না এত। আপনার শরীর খারাপ হবে।

—শরীর! একে কি শরীর বলে!

কাকা বলে ওঠে, মনে সব ছময় গু-মুত ঘাঁটছেন। ওই জন্যেই তো এমন কুঠ ব্যামো।

মা এই অনাসৃষ্টির মাঝখানে পড়ে কি করবে বুঝতে পারে না, থামো না কামিখ্যে, একি হচ্ছে। কত রাস্তা ভেঙে এতদুর এলে—

বড়মা ওধার থেকে বলে, তোর কাছে ব্যাগত্তা করি কামিখ্যে। আর কতা বাড়াসনে ভাই। তাড়াতাড়ি নেয়ে দুটো গরম গরম ভাত খেয়ে নে দিকি।

ঠিক তখনই সদর রোয়াকে এসে দাঁড়ান এক মাঝবয়সী গেরুয়াধারী। কামানো মুখ। কাঁধ ছোঁয়া কালো বাবরি। বেশ কালো রং। আর ভয়ঙ্কর ট্যারা। এই সাধুটিকে আমার মা কেন জানি পছন্দ করে না। দু'চক্ষে দেখতে পারে না রামশরণ কাকা। লোকটির নাকি মা'র দিকে কুনজর আছে। তার কথায়, সাধু নাকি মার দিকে প্রায়ই হাঁ করে চেয়ে রয়। সাধু বলে, জয় হোক মা, বড় অসময়ে এসে পড়লুম। হুঁ, আমিও দুটি গরম গরম ভাত খাবো।

সূর্যকুমার লোকটির দিকে ড্যাবা ড্যাবা কটাক্ষ ছুড়ে বার বারান্দার নালিতে লুঙি তুলে পেচ্ছাপ করতে বসে যান।

বড়মা মাথার বুরুশ কুচি চুলে আলগোছে শাদা ঘোমটা টেনে দিয়ে বলে, হুঁ, হল আজ মেলার ভাত খাওয়া। একসঙ্গে জোড়া অতিথি।

গেরুয়া ট্যারা লোকটি বারান্দার কোণ ঘেঁসে তার ঝুলি রাখে। তারপর তার ভেতর থেকে একখানা কম্বল বার করে ঝটাপট পেতে ফেলে মেঝেয়। কামাখ্যাচরণ হাঁ করে চেয়ে থাকে এই নতুন অতিথির দিকে।

বড়মা বলে, ভাত তো তোর বাড়তি থাকেই মেলা। নাকি চড়াতে হবে।

মা শুধু বলে, দেখি।

সাধু মেঝেয় পাতা ব্যবস্থায় বসে পড়ে বলে, মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার বলে কথা। কিছুই বাড়ন্ত হয় না।

বাইরের নালি থেকে উঠে ঘরে যেতে যেতে সূর্যকুমার বলে যান, এটা সংসার। না হোটেল! মেয়েটা খাটতে খাটতে মরে যাবে। সে খেয়াল কারুর আছে।

মা রান্না ঘরে যেতে যেতে শুধু একবার তাকায় বৃদ্ধের দিকে। বড়মা বলে, অতিথি নারায়ণ বলে কতা।

কামাখ্যাচরণ মার হেঁসেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বউদি, এট্টখানি ছর্ষের তেল দিন তো।

বড়মা বলে, গরমকালেও সব্বাঙ্গে তেল মাখবি ভাই!

—আমরা তো গ্রামে বাছ করি। তুমিও তো ছিলে সেখেনে। এর মধ্যেই ছব ভুলে গেলে!

—তা, আমার জন্যে কি আনলি ভাই?

কাকা ধুতিটুতি খুলে গামছা পরতে পরতে বলে, গাছের ছুকনো কুল। তুমি অম্বল খাবে খাক্‌মা।

—আমসি আনিসনি, আমসি?

কামাখ্যাচরণ রোগা ডিগডিগে কালোকুলো পাঁজরে, বুকে তেলের চাপড় কষাতে কষাতে বলে, বউদি, ঘানির তেল নাকি? দিব্যি ঝাঁজ আছে। হুঁ।

ছবি শান্তনু দে

(চলবে)

রো
রোববারের
মেগা

কলকাতায় নবকুমার

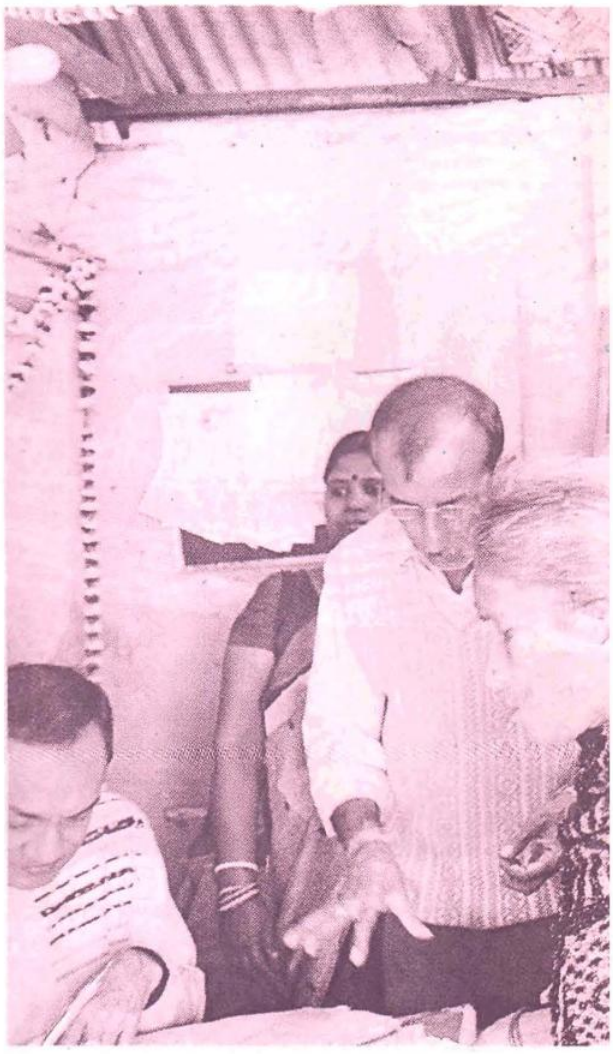

সমরেশ মজুমদার

মাস্টারদার কান্নায় ঘুম ভাঙে নবকুমারের। মাস্টারদার অভিযোগ নবকুমার তাকে নিজে থেকে সিনেমায় অভিনয়ের কথা কিছু জানায়নি। মুক্তো ঘরে আসে। উষা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে তার একটা খাতা আছে। ভবানীপুরে গেলে টাকাকড়ির কী ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কে জানতে বলে নবকুমারকে। মাস্টারদা নবকুমারকে তার জন্য সিনেমায় একটা রোল দেখতে বলে। শেফালি মায়ের সঙ্গে ভবানীপুরে বাড়ি দেখতে যায় নবকুমার। বাড়িটা সুন্দর, পাড়াটাও বেশ শান্ত। হঠাৎ সামনের বাড়িতে একটি মেয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে চিৎকার করতে থাকে।

আটত্রিশ

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে শেফালি মা বলেছিলেন, 'একেই বলে যাবি কোথায়? ওরে যম আছে তোর পিছে। সোনাগাছি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে ভবানীপুরে যাচ্ছি আর দ্যাখো, বাড়ির সামনে ওরকম মেয়ে রোজ ঝামেলা বাধাবে।'

'ক'দিন করবে? একদিন, দুদিন? দরজা না খুললেই তো হল।'

'ওই তো বলল, থানায় যাবে। গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে মা বাবার বিরুদ্ধে বলবে। পুলিশ এসে মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করে মিটিয়ে নিতে বলবে। পাড়ার লোকেরাও বলবে হাজার হোক মেয়ে, বের করে দিলে থাকবে কোথায়।' মাথা নাড়লেন শেফালি মা।

'অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়ে যদি অন্যায় করে, বাইরে রাত কাটায়, বললেও কথা কানে না তোলে তবু তাকে বাড়িতে থাকতে দিতে হবে?' নবকুমার একটু উত্তেজিত।

'আগে ত্যাজ্যপুত্র করা চালু ছিল, ত্যাজ্যকন্যার কথা কেউ ভাবেনি। কারণ মেয়েরা তখন এমন কাজ করার সাহসই পেত না যার জন্যে বাবা-মা তাদের ত্যাগ করতে পারে। প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে জানালে তবে তাদের জন্যে বাপের বাড়ির দরজা বন্ধ হত। এখন শিক্ষিত মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হোটেলে নাচতে যাচ্ছে, ড্রিঙ্ক করছে, লেট নাইটে বাড়ি

ফিরছে। এটা তো আকছার হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি সেই রাত্রে ফেরে না। সাতদিন এক বন্ধু পরের সাতদিন আর একজনের সঙ্গে হুল্লোড় করছে। বাবা মা বলে বলেও যখন পারেন না শেষরাতে তখন মেনে নেন। চিৎকার চেঁচামেচি করে পাড়ার লোকদের জানাতে চান না। যাঁরা মানতে পারেন না তাঁরা দরজা বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু এমন কোনও আইন নেই তারজন্যে চিরকাল দরজা বন্ধ রাখার।' শেফালি মা শ্বাস ফেললেন।

'এরা, মানে এই মেয়েরা এসব করে কেন? টাকার জন্যে?'

নবকুমারের প্রশ্ন শুনে তাকালেন শেফালি মা, 'কেউ কেউ হয়তো এভাবেই টাকা রোজগার করে। কিন্তু বেশিরভাগ স্রেফ ফুর্তির জন্যে করে। জীবনটাকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে চায় তারা। বাবা মা তখন তুচ্ছ হয়ে যায়।

'আমাদের গ্রামে এরকম ঘটনার কথা কেউ ভাবতেই পারবে না।'

'এখন পর্যন্ত হয়তো পারবে না। তবে অসুখটা তো ছোঁয়াচে। বলা যায় না।'

শেফালি মাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়ে নবকুমার দুর্বারের অফিসে গিয়ে সবিতার সঙ্গে দেখা করল।

সবিতা বলল, 'কেমন আছ নবকুমার? কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না। আমার সমস্যা হয়নি। মুক্তোর হয়েছে।'

'মুক্তো?'

'শেফালি মায়ের কাছে কাজ করে। আপনাদের যে ব্যাঙ্ক আছে। উষা, উষা?' মনে করার চেষ্টা করল নবকুমার।

'উষা কোঅপারেটিভ।'

'হ্যাঁ। ওখানে তিন টাকা জমা দেয়। কিন্তু শেফালি মা সামনের মাসে ভবানীপুরে চলে যাচ্ছেন। মুক্তোকেও যেতে হবে। অতদূর থেকে ওর এখানে আসা সম্ভব নয়। তাই আমাকে বলল আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, কী করবে ও?

'তোমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছ?' অবাক হল সবিতা।

'হ্যাঁ।'

একটু যেন ভাবল সবিতা। তারপর বলল, 'একটা অ্যাপলিকেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে সব টাকা তুলে নিয়ে ভবানীপুরের কোনও ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ওকে। সহজ ব্যাপার।' সবিতা বলল।

'ভবানীপুরে উষার কোনও অফিস আছে?'

নবকুমারের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল সবিতা। বলল, 'যৌনকর্মীদের প্রয়োজন মেটাতে এই ব্যাঙ্কের জন্ম। মেয়েরা টাকা জমাতে পারে না, গুণ্ডা বা বাড়িওয়ালির অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে থাকে। বাইরের কোনও ব্যাঙ্কে গিয়ে অ্যাকাউন্ট

ইতি তার পেছনে আসছে কিন্তু পাশাপাশি হাঁটা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না। সে পেছন ফিরে তাকাতেই ইতি হেসে ফেলল, 'ছেলেবেলায় গাঁয়ে এরকম দেখেছি।'

খুলতে চাইলে নানান ঝামেলা। ওইসব ব্যাঙ্ক যেসব কাগজ চায় তা দেওয়া সম্ভব হয় না বেশিরভাগ সময়ে। আমাদের এলাকার মধ্যে উষা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক হওয়ায় ওরা যে যেমন পারে এসে জমা দিচ্ছে। প্রয়োজনে টাকা তুলতে পারছে। এছাড়া আমাদের লোকজন বাড়ি বাড়ি ঘুরে টাকা নিয়ে আসে রসিদ দিয়ে, যদি ওদের পক্ষে ব্যাঙ্কে আসা সম্ভব না হয়। একদিন গিয়ে দেখে এসো। আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। ব্যাঙ্কের কাজকর্ম জানেন এমন শিক্ষিত মানুষই ওখানে কাজ করেন। এই একটা ব্যাঙ্ক কোনওভাবে দাঁড় করানো গিয়েছে। বাইরে আরও ব্যাঙ্ক করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কী, সেটা চাইও না।'

ওরা কথা বলছিল দুর্বারের অফিসের বাইরের ঘরে বসে। ঠিক এইসময় ইতিকে ঘরে ঢুকতে দেখল নবকুমার। একেবারে আটপৌরে পোশাক, মুখে একটুও প্রসাধন নেই। একটা লম্বা খাতা টেবিলের ওপর রেখে সে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসল, 'ভাল?'

নবকুমার নিঃশব্দে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

সবিতা বলল, 'ইতি, নবকুমারকে তোমার খাইয়ে দেওয়া উচিত।'

'না, না। মিছিমিছি কেন—!'

'মিছিমিছি নয় ভাই।' সবিতা বলল, 'তুমি ওর অসুখের খবরটা না দিলে যে কী হত। ডাক্তারবাবুও বলেছেন ওর যে ধরনের পক্স হয়েছিল তা ঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে মারাত্মক কাণ্ড হয়ে যেত। আর খবরটা দিয়েছিলে বলে গুণ্ডারা তোমাকে মেরেছিল। এইসব মিলিয়ে ও তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

নবকুমার হাসল, 'খাইয়ে দিলেই কৃতজ্ঞতা শেষ হয়ে যাবে?'

'অকৃতজ্ঞদের সেটা মনে হয়।' সবিতা বলল।

'আমি একটা সাধারণ কাজ করেছি, তারজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঠিক নয়। আর সেদিন যারা আমাকে মারতে এসেছিল তারা এখন বন্ধুর মতো হয়ে গেছে।'

নবকুমারের কথা শেষ হলে ইতি প্রথমবার কথা বলল, 'জানি।'

'জানিস মানে?' সবিতা তাকাল।

'ওরাই আমাকে বলেছে সব কথা। ওঁকে আসতেও বলেছিল, উনি আসেননি।'

'না গিয়ে ভালই করেছে। সবাই তো তোর মতো নয়।' সবিতা বলল।

'তাহলে আমি উঠি—!' নবকুমার উঠে দাঁড়াল।

'তুমি ইতিকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছো না?' সবিতা বলল, 'ও এখনও পুরো সুস্থ নয়। আমরা ওকে দুর্বারের কাজে নিয়েছি। আর কাজ শিখতে গিয়ে ও বলছে আর পুরনো পেশায় ফিরে যাবে না। ও যা রোজগার করত সেই টাকা তো আমরা দিতে পারব না। কিন্তু সামান্য টাকাতেই ও রাজি হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন জায়গা দরকার। এই বাড়িতে কুলোচ্ছে না।'

হঠাৎ নবকুমারের মনে হল শেফালি মা ভবানীপুরে চলে গেলে ওই বাড়ির দোতলা খালি হয়ে যাবে। বাড়িটা যদি তিনি বিক্রি করে না দেন তাহলে নিশ্চয়ই ভাড়া দেবেন। ওখানে কোনও ভদ্রপরিবার ভাড়া দিয়ে থাকবে না। দিতে হলে যৌনকর্মীদেরই দিতে হবে। সে বলল, 'আমি শেফালি মাকে বলতে পারি।'

'ওঁর সন্ধানে জায়গা আছে? এ পাড়ার বাইরে হলে কিন্তু অসুবিধে হবে।'

'উনি আগামী মাসের এক তারিখে ওই বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে চলে যাচ্ছেন। বাড়িটা হয় উনি ভাড়া দেবেন নয় বন্ধ করে রাখবেন।'

'ও। তাই মুক্তোর জন্যে ব্যাঙ্কের খবর নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আজই কথা বলতে হয়। ক'টা ঘর আছে?

'চারটে তো হবেই। দোতলায়।'

'আমি কমিটিকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি। শেফালি মায়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভাল। তুমি শুধু বলে রেখো আমাদের না জানিয়ে তিনি যেন অন্য কোনও ব্যবস্থা না করেন।' তারপরেই সবিতা ইতির দিকে তাকাল, 'তুই এক কাজ কর। নবকুমারকে দিয়ে বলানো ঠিক নয়, তুই এই কথাটা আমাদের তরফ থেকে বলে আয়। উনি কী বলছেন জানলে আজ বিকেলের মিটিং-এ সবাইকে বলব।'

ইতি মাথা নাড়তেই নবকুমার বাইরে বেরিয়ে এল। ইতি তার পেছনে আসছে কিন্তু পাশাপাশি হাঁটা ঠিক হবে কিনা তা বুঝতে পারছিল না। সে পেছন ফিরে তাকাতেই ইতি হেসে ফেলল, 'ছেলেবেলায় গাঁয়ে এরকম দেখেছি।'

'কীরকম?'

'স্বামী হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে, বউ পড়ে থাকছে পেছনে। আমার পাশে হাঁটতে কি অসুবিধে হচ্ছে?' হাঁটতে হাঁটতে ইতি জিজ্ঞাসা করল।

'আমার অসুবিধে হবে কেন? তোমার কথা ভেবেই—।'

'এখন আমার কোনও অসুবিধে নেই কারণ আমি আর কাউকে ভয় করি না। গুণ্ডা, দালাল, বাড়িওয়ালি, জেনে গিয়েছে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই। মুখের এই দাগগুলো যদি চিরকাল থাকত খুব খুশি হতাম।'

'মুখে তো তেমন ছাপ পড়েনি।'

'কেন পড়ল না। ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকলে আর কেউ আমার দিকে তাকাত না।'

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। সোনাগাছিতে দুপুরবেলায় ভিড় কম থাকে। যারা ছিল তারা উদাস চোখে তাদের দেখল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ইতি বলল, 'তাহলে আপনিও চলে যাচ্ছেন এখান থেকে! ভালই হবে। এই নরকে কতদিন পড়ে থাকবেন।'

'সোনাগাছির বাইরেটা কি স্বর্গ বলে তোমার ধারণা?' নবকুমার বলল, 'এই নরকে যারা রোজ আসে ফুর্তি করতে তারা তো ওই স্বর্গের বাসিন্দা।'

'সেটা ঠিক। আমার না আজকাল খুব ইচ্ছে হয় ওই লোকগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে দিয়ে আসতে, ওদের স্বরূপ জানিয়ে আসতে। তারপর মনে হয়, কী লাভ। ওরা আসে বলেই এখানকার মেয়েরা বেঁচে থাকতে পারে। আচ্ছা, আপনি কিছুদিন পরে এখানকার কথা ভুলে যাবেন না।'

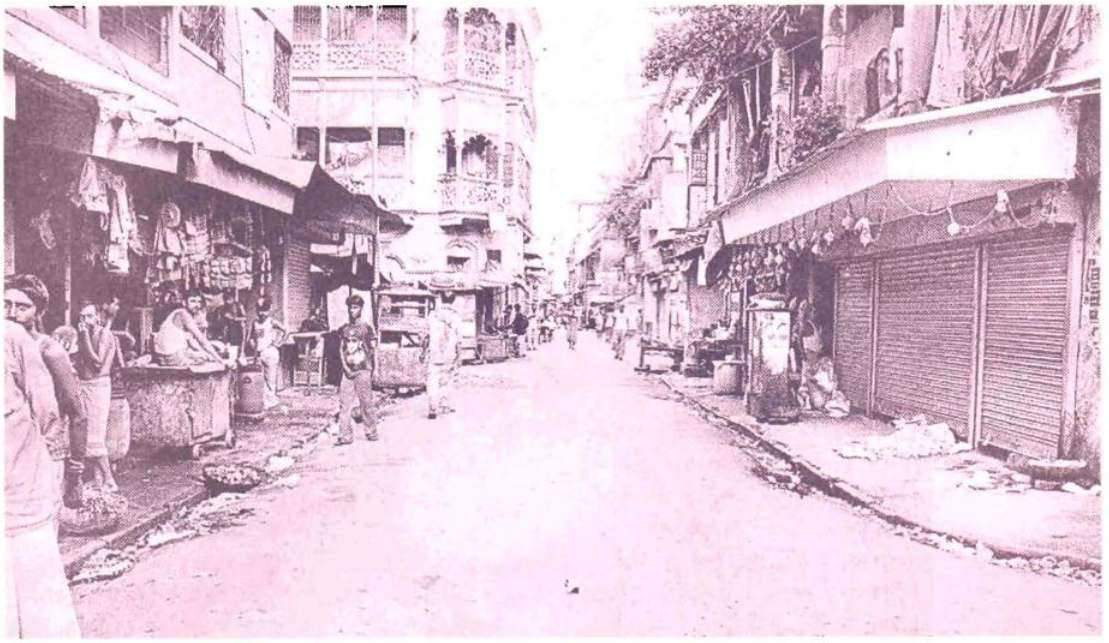

'দ্যাখো, কলিকাতায় যে রাত্রে প্রথম এসেছিলাম সেই রাত্রেই এই পাড়ায় থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। এখানকার কথা কি ভোলা যায়?'

'কী কী মনে থাকবে?'

'সব। এই পাড়া, ঝগড়াঝাঁটি, দুর্বার সমিতি—।'

'আর?'

হেসে ফেলল নবকুমার। ইতি জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন কেন?'

'রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?'

'বা রে! আমি জোড়াসাঁকোতে একদিন গিয়েছিলাম।'

'তাই! দ্যাখো, আমার আজও যাওয়া হল না।'

'যাবেন? কাল পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।'

'কখন যেতে হবে?'

'ভোরবেলায়। শুনেছি তখন উৎসব হয়।'

'ঠিক আছে। যাব।'

'তাহলে ভোর সাড়ে পাঁচটায় গলির মুখে ট্রাম স্টপেজে চলে আসবেন। আমি তো ওইদিনে কখনও যাইনি। আপনার জন্যে যাওয়া হবে।'

ওরা বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। এসময় দরজায় কোনও মেয়ে নেই। নবকুমার বলল, 'চলুন।'

'আপনি কিন্তু জবাবটা এখনও দেননি।'

'কীসের?'

'আর কি মনে থাকবে জিজ্ঞাসা করতে হেসে পাশ কাটিয়েছেন!'

'কাল বলব। জোড়াসাঁকোতে গিয়ে।' নবকুমার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সিঁড়িতে, এখানে ওখানে মেয়েরা অলস সময় কাটাচ্ছিল। ইতিকে দেখে তারা অবাক। ইতি গম্ভীর মুখ করে নবকুমারের পেছন পেছন দোতলায় উঠে এল। মুক্তো দাঁড়িয়েছিল দরজায়।

নবকুমার বলল, 'তোমাকে এখানকার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে সব টাকা তুলে নিয়ে ভবানীপুরের ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।'

'ও বাবা। এ তো ঝামেলার ব্যাপার।' মুক্তোর মুখ শুকনো।

'কোনও ঝামেলা নেই। আমি দরখাস্ত লিখে দেব। তুমি সই করে দুর্বারে গিয়ে সবিতাদির সঙ্গে দেখা করবে। এর নাম ইতি, এর কাছেও যেতে পার। শেফালি মা কোথায়?' নবকুমার জিজ্ঞাসা করল।

'এইমাত্র খেয়ে দেয়ে শুয়েছে।'

ইতি বলল, 'তাহলে কি আমি বিকেলে আসব?'

'দাঁড়াও দেখি।' মুক্তো চলে গেল। এবং ফিরে এল তখনই, 'এসো।'

শেফালি মা খাটে বসে বই পড়ছিলেন। ইতিকে দেখে অবাক হলেন।

নবকুমার বলল, 'মুক্তোর ব্যাঙ্কের ব্যাপারে খোঁজ নিতে দুর্বারের অফিসে গিয়েছিলাম। সবিতাদি বলল, আপনি যদি এই দোতলা ভাড়া দেন তাহলে আগে ওদের বলতে। ওদের জায়গার অভাব হচ্ছে।'

'এটি কে?'

'দুর্বারে কাজ করে। ওর নাম ইতি।'

'তোমার পক্ষ হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' নিচু গলায় বলল ইতি।

একটু ভাবলেন শেফালি মা, 'তুমি কি সেই মেয়ে যার কথা দুর্বারকে বলায় দালালরা নবকুমারের ওপর হামলা করেছিল?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল ইতি।

'তুমি দুর্বারের কাজ করছ, ব্যবসায় নেই?'

'না। আমি আর কখনও ওই জীবনে ফিরে যাব না।' জোর দিয়ে কথাগুলো বলল ইতি। আর তখনই ফোনটা বেজে উঠল।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে
সেন
সলিউশনস

হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কিসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

পুজোর পরেই আমার দিদির বিয়ে। কিন্তু দিদির বিয়েতে কী রকম সাজব—বুঝতে পারছি না। শাড়ির সঙ্গে কী পরব, সালোয়ার কামিজের সঙ্গেই বা কী পরব—সবকিছু মিলিয়ে খুব কনফিউজড। আমার গায়ের রং কালো। আমি ডিপ কালারের জামাকাপড় পরতে ভালবাসি। তুমি প্লিজ আমাকে এ ব্যাপারে সাজেশন দাও।

—ডলি রায়, কলকাতা-৬৫

প্রথমেই তোমার দিদিকে কনগ্র্যাচুলেট করি অন হার নিউ লাইফ। শাড়ি পরলে তুমি তার সঙ্গে হেভি জুয়েলারি পরতে পারো। চুলটাও খোঁপা করে বাঁধতে পারো এবং হেভি মেকআপও করতে পারো। কিন্তু সালোয়ার কামিজ পরলে তার অ্যাকসেসারাইজেশন এক্কেবারে অন্যরকম হবে। এর সঙ্গে করতে হবে লাইট মেকআপ। চুল খোলা রাখতে পারো বা পনিটেল করতে পারো, সঙ্গে পরতে হবে লাইট জুয়েলারি। এটা এক্কেবারে রং নোশন যে গায়ের রং কালো হলে ব্রাইট কালার পরা যায় না। ইউ ক্যান চুজ ইওর ওন কালার।

আমার আর আমার হাজব্যান্ডের বেশ কয়েক বছর হল, ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। বছর দুয়েক হল আমার বাচ্চাকে আমি দার্জিলিং-এ হস্টেলে দিয়েছি। আমি ও আমার হাজব্যান্ড দুজনেই ফাইনানশিয়ালি ইনডিপেন্ডেন্ট। যখন আমি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন ওর হার্শ লাইফস্টাইল দেখে খুব ডিপ্রেসড হয়ে পড়ি। ভাবি ওকে নিয়ে আসব। আবার ভাবি যে এই পরিস্থিতিতে ওকে আনাটা ঠিক হবে কি না। আমাকে এই ডিলেমা থেকে বাঁচাও।

—দেবলীনা ভট্টাচার্য, গলফগ্রিন

আপনার যদি মনে হয় যে, আপনার বাচ্চা হস্টেলে খুব হার্শ লাইফস্টাইল লিড করছে এবং তাতে আপনার ডিপ্রেশনও হচ্ছে—তাহলে ওকে কলকাতায় এনে কোনও স্কুলে ভর্তি করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনার বাচ্চা একা নয়। তার মতো অনেক বাচ্চাই একই হার্শ লাইফস্টাইলে মানুষ হচ্ছে। আপনার পরিস্থিতি দেখে আমার যা মনে হয়, হস্টেলই আপনার ছেলেকে ভালভাবে মানুষ হতে সাহায্য করবে।

সম্প্রতি আমি ব্যাংকক, পাটায়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাচ্চাদের নিয়ে বিচ-এই বেশিরভাগ সময়টা থাকতে হয়েছিল। যার ফলে চারগুণ কালো হয়ে ফিরেছি। কী করলে আমি এই ট্যান রিমুভ করতে পারব? আমি বাজারের কোনও আর্টিফিশিয়াল ব্লিচ ইউজ করতে চাই না। প্লিজ আমাকে কিছু হোম রেমিডিস দাও।

—সোমদত্তা গাঙ্গুলি, বেহালা

হোম মেড রেমিডি বেশ কয়েকটা আছে। তবে কোনওটাই বাজারের কোনও আর্টিফিশিয়াল ব্লিচের মতো

আমি একটা নামী হোটেলে চাকরি করি। অনেক সময় নাইট ডিউটির পর মেকআপ না উঠিয়েই শুয়ে পড়ি। এতে কি স্কিনের কোনও ক্ষতি হয়?

—সাথী সেন, আলিপুর

মেকআপ না তুলে শুয়ে পড়ার মতো ক্ষতি স্কিনের পক্ষে আর দ্বিতীয়টি নেই। মেকআপ সমস্ত স্কিনের পোর্সকে বন্ধ করে দেয়। যার ফলে স্কিন ব্রিদ করতে পারে না। এর থেকে নানারকম স্কিনের প্রবলেমও হতে পারে। দ্য বেস্ট রেমিডি ইজ তুমি যতই টায়ার্ড থাক না কেন, দু'মিনিট সময় স্পেন্ড করে একটা ভাল ক্লেনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে শোবে।

তাড়াতাড়ি কাজ করবে না। ধৈর্য ধরে লাগাতে হবে। টম্যাটোর রস, টক দই, কমলালেবুর রস, পাতিলেবুর রস— প্রত্যেকটিই অ্যাসেটিক ইন নেচার। তাই ন্যাচারাল ব্লিচ-এর কাজ করে। এগুলো প্রত্যেকটিই ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড।

আমার বয়স আঠারো। আমি দিনকে দিন নেট স্যাভি হয়ে যাচ্ছি। সারারাত ধরে নেট সার্ফ করি। যার ফলে সকালে উঠতে পারি না। সারাদিন ড্রাউজি লাগে। কী করলে এই সমস্যা থেকে বেরতে পারব?

—জয়দীপ চ্যাটার্জি, যাদবপুর

আজকাল বেশিরভাগ টিনএজারদেরই একই প্রবলেম। একটা কাজ করো। বাড়ি থেকে ইন্টারনেট লাইন কাটিয়ে দাও। খুব প্রয়োজন হলে কোনও সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে দরকারি কাজকর্ম সেরে ফেলতে পারো। প্রথমে অসুবিধা হলেও আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে।

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

তোপসের টোপ

সোনার কেল্লা। তোপসের জেল্লা। রহস্য রান্নার সুলুকসন্ধান
ভজহরি মান্নায়। মুখে দিলে মার দিয়া কেল্লা। অর্পিতা চৌধুরী

—তুমি গোয়েন্দা গল্প পড়?

—হ্যাঁ।

—কার কার গল্প পড়েছ?

—দীপক চ্যাটার্জি, ব্যোমকেশ বক্সি, শার্লক হোমস...

—ফেলুদার নাম শুনেছ?

—না তো! সে কে?

সত্যজিৎ রায়ের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়িতে তাঁর সামনে হাফপ্যান্ট পড়া ক্লাস নাইনের ছাত্র অকপটে স্বীকার করে নিয়েছিল ফেলুদাকে নিয়ে তার জ্ঞানের বহর। তার স্কুলের মাস্টারমশাই লজ্জায় অধোবদন। ছি ছি! তিনি ভাবতেও পারেননি, যে ছাত্রকে তোপসের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সত্যজিৎবাবুর কাছে এনেছেন (যদিও ছেলেটি সেখানে নিয়ে যাওয়ার কারণ বিন্দুবিসর্গ জানে না), সে কি না ফেলুদার নামই শোনেনি!

কিছুক্ষণ পর মাস্টারমশাইয়ের অবাক হওয়ার পালা। তাঁর স্কুলের ওই ছাত্রটিকেই সেলুলয়েডে ফেলুদার স্যাটেলাইট হিসেবে বেছে নিলেন মানিকবাবু। খোঁচা খোঁচা চুলের এই ছেলেটি তোপসের জন্য আইডিয়াল—এই বার্তা ভিজ্যুয়ালাইজ করেছিল ফেলুদা-স্রষ্টার ইনার আই। কিন্তু ছ'ফুট চার ইঞ্চির জিনিয়াস টের পাননি যে তাঁর সামনের ওই খুদেটি

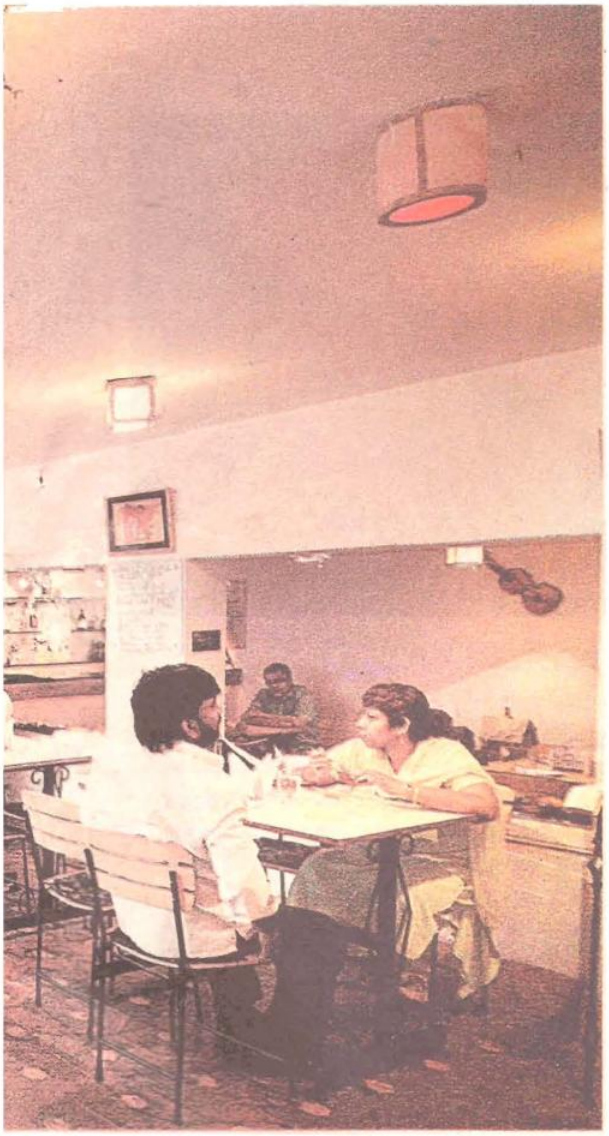

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র-র থেকেও বড় সমঝদার

পঞ্চাশের দোরগোড়ায় পৌঁছে এখনও 'তোপসে' বলে পরিচিত হতে ভালবাসেন শেয়ার বাজারের শাহেনশা সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়। ছোট থেকেই রান্নার অসম্ভব শখ। পাড়ার গলিতে ফুটবল, ক্রিকেট আর আড্ডার সঙ্গেই চুম্বকের মতো টানত রান্নাঘরের কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি। দিদিমার পাশে বসে মন দিয়ে দেখতেন আলুভাজা মুচমুচে রাখার দৃশ্য।

এরপর পাঠভবন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গণ্ডি টপকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সিদ্ধার্থর জীবন থেকে রান্না বা আড্ডা—কোনওটাই বিদায় নেয়নি। শেয়ার বাজারের টাকা-আনা-পাই-পয়সা হিসেবের কচকচানির মধ্যেও বহাল তবিয়তে ছিল সান্ধ্য আড্ডা। এক জায়গায় হতেন পাঁচ মাথা। তোপসে ছাড়া বাকি চার মাথার মধ্যে একজন পরিচালক গৌতম ঘোষ। অন্যরাও সবাই ওজনদার নাম। এঁদের এক আড্ডাতেই রেস্তোরাঁ শুরু করার প্রস্তাব ওঠে। নামটা এসেছিল তোপসের মগজাস্ত্র থেকেই—'ভজহরি মান্না'। বছর চারেক আগে, পাড়ার মোড়ের গাছে বর্ষার 'প্রথম কদম ফুল' আসার আগেই মার্চ মাসের একদিনে একডালিয়ার একটি গ্যারাজ ঘরে শুরু হল ভজহরির পথ চলা।

প্রথম থেকেই ঠিক ছিল, বাঙালি রান্নার ওপর জোর দেওয়া হবে। কিন্তু কখনওই কূপমণ্ডুক হবেন না তাঁরা। ভজহরি মান্না ইস্তাম্বুল-জাপান-কাবুল চষে হাজারো রান্না শিখে এসেছিল। তাই এই রেস্তোরাঁর কাঁথা স্টিচের কাজ করা মেনুকার্ডের মেনুতেও থাকবে বিশ্বায়নের ছোঁয়া। তো এত কিছু নিয়েও, শুরুতে বিক্রিবাটা বা রেস্তোরাঁর ভবিষ্যৎ ছিল 'হাইলি সাসপিশাস'। কিন্তু দিন পনেরোর মাথায় তোপসের রেস্তোরাঁ হঠাৎ জটায়ুর বই হয়ে গেল। গোয়েন্দা প্রখর রুদ্রের মতোই তার বিরাট ডিম্যান্ড। কোনও উর্দি পরা শ্যেফ বা খুন্তি হাতে কুস্তি নয়, কোমরে গামছা বাধা উড়ে বামুনের হাতের রান্নাই তখন রেস্তোরাঁয় দারুণ হিট।

এই রেস্তোরাঁর কনসেপ্ট তখন ছিল পাইস হোটেলের মতো। এমনকী, ওজনদরে বিক্রি হত কাঁচা মাছও। রীতিমতো ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা থাকত রোজকার মেনু। একডালিয়ার আউটলেটে সেই ব্ল্যাকবোর্ড এখনও আছে। সেখানে মেনুকার্ড থেকে বিল পেমেন্ট—সবেতেই বেশ একটা পুরনো পাতি 'কেবিন' মার্কা হাবভাব ছিল। কিন্তু এখন শহরের বাকি পাঁচ ভজহরি মান্না অনেক বেশি সফিসটিকেটেড।

দিন দিন এই রেস্তোরাঁর সংসার বাড়ছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে ভক্ত। কিন্তু সংসার বাড়লেও যৌথ পরিবারের রীতিনীতিতে ফাটল ধরেনি। এখনও এই রেস্তোরাঁর

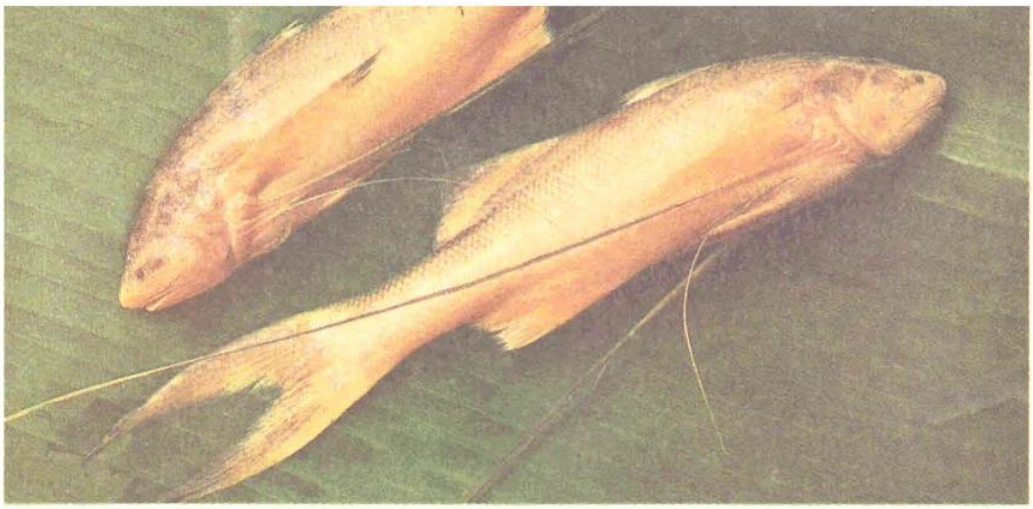

একটাই রান্নাঘর। সেখান থেকেই খাবার যায় ছ'টা আউটলেটে। শুরুর দিকে সিদ্ধার্থবাবুরা নিজে গড়িয়াহাট থেকে বাজার করতেন। এখন আর অতটা সময় না দিতে পারলেও রেস্তোরাঁকে নিয়ে নিত্যনতুন প্ল্যান চলছেই। যেমন, তোপসের ইচ্ছে, মেনুকার্ডে সেদ্ধর আগমন। মানে, ভাতের সঙ্গে আলুসেদ্ধ, উচ্ছেসেদ্ধ আর বকফুল ভাজা খাওয়ানোর ইচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে না সেই বাঙালি ভোজনরসিকদের জন্যই। রেস্তোরাঁয় এসে কেউ কম তেল-মশলা দেওয়া খাবারই খেতে চায় না, তারপর আবার সেদ্ধ! তবে শীতের পরে ভজহরিতে আসতে চলেছে কম মশলার রান্না—ডায়েট ভজহরি। পুজোর চারদিন কিন্তু ভজহরিতে নো ডায়েটিং। প্রতিবছরের মতো এবারেও কবজি ডুবিয়ে খাওয়ার জন্য হরেকরকম খানাপিনা হাজির।

তোপসের রেস্তোরাঁয় ফেলুদা হাজির হবে না, তা কখনও হয় না কি! হিন্দুস্থান রোডের ভজহরি মান্নার ইনঅগারেশন পার্টি আলো করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর সব্যসাচী চক্রবর্তী—দু'জনেই।

'সোনার কেল্লা'র পরিচালকের বাড়িতেও ভজহরি মান্না প্যাকেট-বন্দি হয়ে পৌঁছে গিয়েছে। তারিফ মিলেছে সত্যজিৎ-পুত্রের কাছ থেকে।

রেস্তোরাঁর মালিকমহলে ওপার বাংলার পাল্লা ভারি। কিন্তু মেনুকার্ডে বা খাবারের স্বাদে কিন্তু এপার ওপার ভাই ভাই। সেখানে লাল-হলুদ বা সবুজ-মেরুন কেউই কাউকে ছাপিয়ে যায়নি। তাই এখানে ঢাকাই তিহরি বিরিয়ানির সঙ্গে পাওয়া যায় মোহনবাগান চিংড়ি কাবাব। ঘটিদের মিষ্টি-প্রেমের কথা মাথায় রেখে সেখানে চিংড়ির সঙ্গে যুগলবন্দি আনারসের। অবশ্য শুধু চিংড়িই নয়, এখানে বছরভর মেলে পদ্মার ইলিশও।

এভাবেই আধুনিকতার মিশেলে বাঙালিয়ানাকে ধরে রাখতে চায় ভজহরি মান্না। তাই অঙ্গসজ্জায় সুকুমার রায়ের কাঠবুড়ো, মেনুকার্ডে কাঁথা স্টিচ; এমনকী ককটেলের নামেও বঙ্গজীবনের অঙ্গের ছোঁয়া। নইলে 'হারানো সুর', 'নীল আকাশের নীচে' আর 'রূপসী বাংলা' ককটেল কোথায় পাবেন বলুন!

তো সে কত কথাই তো আমরা বলতেও পারি না, ভাবতেও পারি না। যে রেস্তোরাঁর প্রথম মাসের বাড়িভাড়া যোগাড় করতে মালিকদের কপালে ভাঁজ পড়েছিল, সেই রেস্তোরাঁর ভিজিটর্স বুকে আজ গুলাম আলির উর্দুতে লেখা প্রশংসার পাশাপাশি ঝলমল করছে ওয়াসিম কাপুরের শিল্পকর্ম। এরকম আশ্চর্য ঘটনা যে পটলডাঙার চাটুজ্যেদের রকে বসে ভজহরি মুখুজ্যের দেওয়া গুল-গল্পের বাইরেও সত্যি হতে পারে, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে ভজহরি মান্না।

চার পিস তোপসে সোনার কেল্লা করতে লাগবে
তোপসে মাছ —৪টে
আদা রসুন বাটা—১০ গ্রাম
পাতিলেবু — ১টা
ডিম —১টা
ময়দা —৫০ গ্রাম
বেসন — ৫০ গ্রাম
কালো জিরে — সামান্য
সাদা তেল — ১৫০ গ্রাম
বেকিং পাউডার/খাওয়ার সোডা—এক চিমটে

এবার

প্রথমে মাছগুলোকে পরিষ্কার করে ছুরি দিয়ে চিরে চিরে দিন। তাহলে মাছের মধ্যে মশলা ঢুকতে সুবিধে হবে। একটা পাত্রে ডিম ফেটিয়ে, তার মধ্যে আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, লেবুর রস, নুন দিন। এই মিশ্রণের মধ্যে তোপসে মাছগুলোকে দশ মিনিট ম্যারিনেট করুন।

অন্য একটি পাত্রে জল নিয়ে ময়দা, বেসন ; খাওয়ার সোডা বা বেকিং পাউডার দিয়ে ফেটিয়ে নিন। তাতে কালো জিরে মেশান। নুন দিন স্বাদমতো। এতে মাছগুলোকে চুবিয়ে তুলুন। ননস্টিক প্যান-এ তেল গরম করুন। তাতে মাছগুলো ছেড়ে সিমে এপাশ ওপাশ করে ভাজুন। সোনালি রং ধরলে তুলে নিন। কাসুন্দির সঙ্গে • পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID
NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT
A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech
Dream. Believe. Create.

USE
Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
033-40026160

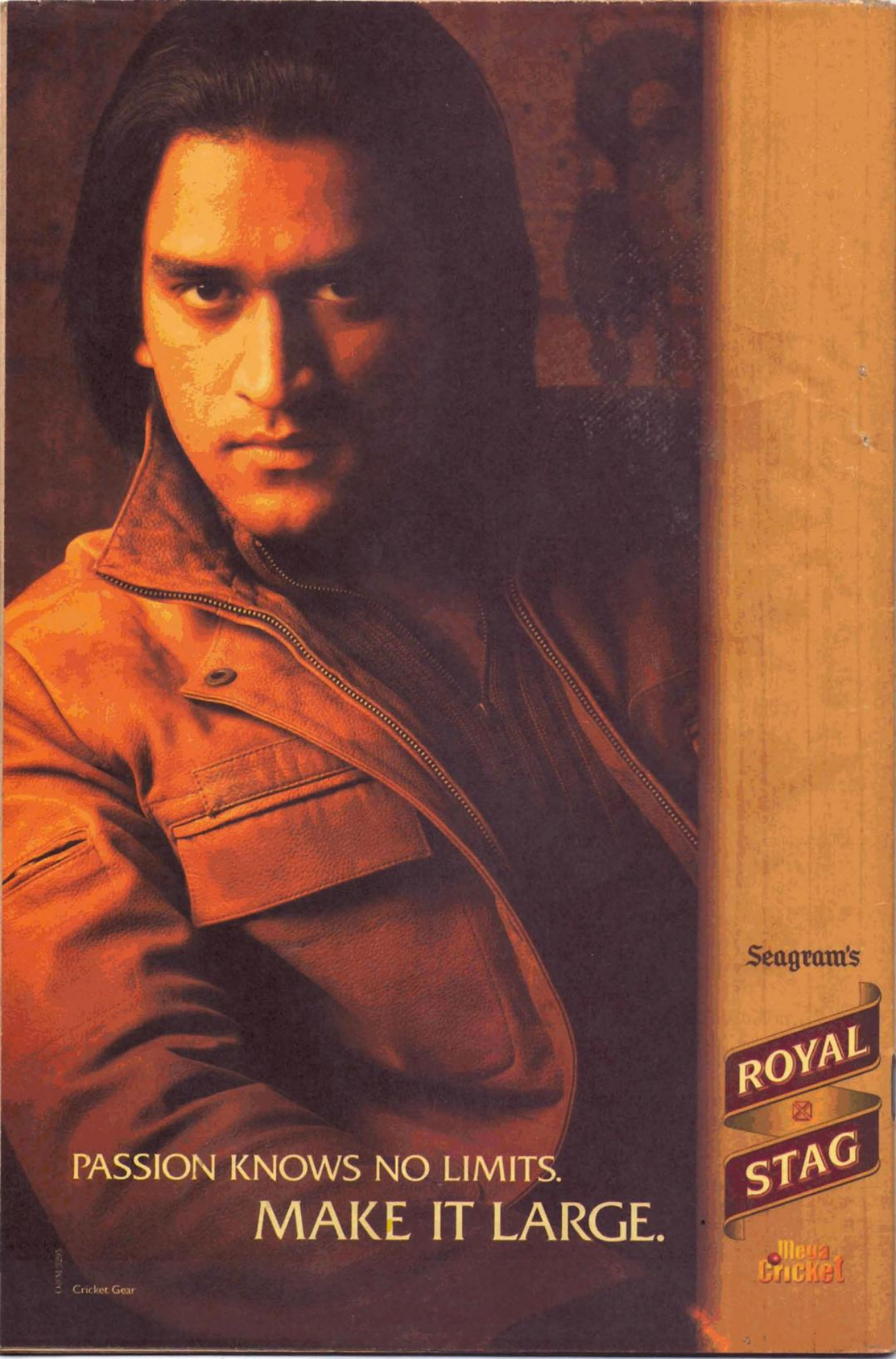
PASSION KNOWS NO LIMITS.
MAKE IT LARGE.
Seagram's
ROYAL
STAG
Mega Cricket
Cricket Gear